হিরণ্যগর্ভ
অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
১লা বৈশাখ, ১৪২২

Hiranyagarbha
Volume 8, No. 4
हिरण्यगर्भ
अष्टम वर्ष, चतुर्थ संख्या
तारिख–१५ अप्रैल, २०१५

১'লা বৈশাখ, ১৪২২ 15th April, 2015

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	পরম পুরুষের নিরন্তর গভীর স্পর্শে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী	শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ	07
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	08
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	09
	নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	10
	কাশীধামে পঞ্চক্রোশী	স্বামী সংবেদানন্দজী	11
	ভগবান স্বপ্রকাশময়	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	মহর্ষি শ্যাবাশ্ব	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	13
	বিশ্বজননী দেবী সারদামণি	শ্রীমতী সুস্মিতা বসু	14
	যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	17
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	18
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	19
	যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	20
	গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ	শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য	23
हिन्दी विभाग ः—	परम पुरूष के निरंतर गभीर स्पर्श में	श्रीविमलानन्द	26
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीविमलानन्द	28
	नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	29
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	30
	महर्षि श्यावाश्व	श्रीमती ज्योति पारेख	31
	काशीधाम में पंचकोशी	श्रीविमलानन्द	32
	भगवान स्वप्रकाशमय	श्रीमती ज्योति पारेख	34
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	34
	परमब्रह्म के साक्षी	श्रीविमलानन्द	35
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	36
	युगावतार परम पुरूष श्रीश्री रामकृष्ण	श्रीमती ज्योति पारेख	37
	ऐतरेयोपनिषद्	श्री सी.पी. सिंघल	40
English Section ः—			
	Glimpses of Sri Ramakrishna Leela-Tattwa	Dr. Partha Pratim Chakrabarti	42
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	45
	My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	46
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	47
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	48

ISBN No. 978-93-80373-80-5 Cover : Sri Sri Ramakrishnadev

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

চৈত্রশেষের অলস দুপুরে এলোমেলো উদাসী হাওয়ায় বৃক্ষচ্যুত বিশুষ্ক পত্ররাজি স্মরণ করিয়ে দিল যে কালগর্ভে বিলীন হল আরও একটি বছর। চৈত্রের শেষলগ্নে পালিত হ'ল বাসন্তিক নবরাত্রি উৎসব। প্রতি বছরের ন্যায় এ'বছরও মহাষ্টমী তিথিতে আমরা আরাধনা করেছি শ্রীশ্রীমা প্রতিষ্ঠিত আশ্রম-অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণাকে। শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণা বিশ্বজননী মহামায়া - কালের সসীম গণ্ডিতে বিরাজিত পরম মমতাময়ী রূপ - ভক্তবৎসলা, মনোবাঞ্ছাপূরণকারিণী, প্রাণস্বরূপিণী মহাশক্তি। আবার বৈরাগ্যপথের পথিক সাধকের হৃদয়কন্দরে জ্ঞান-বৈরাগ্য-সিদ্ধিদাত্রী পরমাশক্তি।

মাতৃ চরণাশ্রিত আমাদের ভক্তিবিহ্বল চিত্ত উধাও হয় স্নিগ্ধ-সমীরণ-শীতল গঙ্গাতীরে যেখানে পঞ্চবটীর ছায়ায় দশদিক আলোকিত করে অবস্থান করেন বাঙালীর মনের দেবতা, অবতারবরিষ্ঠ পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বাঙালীর স্মরণে-মননে, প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনে, ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত যাঁর জ্যোতির্ময় অস্তিত্ব। যিনি আমাদের প্রতি পরম অনুকম্পায় ধারণ করেছিলেন দিব্য মানবশরীর; আবার নিত্যলীলায় যিনি অবাঙ্মানসগোচর বিরাটপুরুষ। তিঁনি মহাত্মাগণেরও মহাত্মা, ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ, আবার তিঁনিই শ্রীশ্রীমায়ের মনোমন্দিরনিবাসী ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তাঁর নিঃসীম বিরাটত্ব, অতিপ্রাকৃত অণুধ্যান, দেব-গন্ধর্বেরও সাধ্যাতীত - আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবাত্মাগণ তো তুচ্ছ!

আজ নববর্ষের পরম পুণ্যলগ্নে ভক্তিবিনম্রচিত্তে আমরা প্রণতঃ হই তাঁর রাতুল চরণে আর প্রার্থনা করি ''হে জ্যোতির্ময়! আপনার অখণ্ড অনুকম্পার কণামাত্র আমাদের মনোমন্দিরে সততঃ জাগরিত থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্মেষ ঘটাক।'' আজ নববর্ষের পুণ্যলগ্নে শ্রীশ্রীমা ও ব্রহ্মবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণকমলে হিরণ্যগর্ভের এই নববার্ষিক সংখ্যাটি নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম। আমাদের কণ্ঠে সততঃ ধ্বনিত হোক তাঁদের জয়গান।

''জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণাং জগদ্‌গুরু।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।।''

Withered leaves falling from trees, dislodged from the branches by the swirling winds of late spring, sends in the reminder that another year has silently receded into the past. Spring brings joy in our pious minds as the Navratri festival is solemnized in this season every year. Like every year, we celebrated Annapurna Puja in our Ashram premises with due verve and devotion. Mother Annapurna is the incarnation of Goddess Supreme. In the realm of material world, She holds us in Her fold with softest compassion, fulfilling our prayers and instilling life-power amongst all living beings. For saints and savants, who tread the path of austerity, She showers knowledge, penance and emancipation.

Sitting in the tranquility of our Ashram, our pious mind drifts to wind-swept banks of the Ganges at Dakshineshwar where Divine Incarnate Ramakrishna Paramahansa adorned the world to leave His indelible spiritual legacy amongst the Bengalis and the Indians at large. His omnipresent existence is felt in every walk of life, in every pious thought that sweeps through our minds. He assumed human form out of sheer compassion to mankind; but, His true ethereal existence goes beyond the imaginable confines of time, space and mind. He is revered as "Avatar-barishtha" – the venerable saint amongst the saints. His true identity lies in the fact that He is Brahmarshi Vashisthadeva, one of the ten "Manasputras" of Brahma. He incarnated Himself as Sadhak Ramprasad, the great saint-poet of Bengal; He resides in the mind of Sree Sree Maa as Bhagwan Shri Vishnu. Even as Gods and Gandharvas cannot fathom His true self, it is truly beyond the limits of mere mortals to comprehend His infinite glorious omnipresence.

On the auspicious occasion of Bengali Naba Barsha, we offer our humble obeisance to His lotus feet and beseech Him with our humble prayer "Haloed Lord ! Kindly ignite spiritual awakening in us through your incessant compassion on our humble mind".

Let us submit this special edition of Hiranyagarbha to the lotus feet of Sree Sree Maa and Brahmavarishtha Shri Shri Thakur and chant hymns in reverence to Their glorious greatness.

"Jananing Saradang Deving Ramakrishnang Jagatguru
Padapadmey Tayoh Shritwa Pranamami Muhurmuhuh"

পরম পুরুষের নিরন্তর গভীর স্পর্শে

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

তখন কালীঘাটের নিকট চেতলায় রথের মেলা বসিত। সেই রথের মেলা হইতে আমার মাতৃদেবী একখানি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মৃন্ময় মূর্তি কিনিয়া দিয়াছিলেন।

রথের মেলা হইতে ক্রীত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূর্তি

উহা আমাদের বৈঠকখানায় সাজানো থাকিত। ছেলেবেলা হইতেই কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলাদি আমার খুব ভালো লাগিত। সেই কারণে প্রতিবৎসর আমার মাতা আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই রথের মেলায় যাইতেন এবং খেলনা কিনিয়া দিতেন। আমি বায়না করায় সেবার মাটির পুতুল কেনা হইল না, তাহার পরিবর্তে তিনখানি পছন্দসই মহামানবের মূর্তি কেনা হইল। — শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একবার কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়ে ঘরের পর্দা উড়িয়া গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিটি ভাঙিয়া যায়, তাহাতে আমার মন খুব খারাপ হয়। তখন শুধু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও রবীন্দ্রনাথ রহিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমার কক্ষেই অবস্থান করিলেন আর শ্রীরবীন্দ্রনাথ আমাদের বৈঠকখানায়, সঙ্গীতাদির চর্চা হইত বলিয়া সেখানেই অবস্থান করিলেন।

বাল্যজীবনের সেই মৃন্ময়মূর্তি যে কোনদিন আমার জীবনে চিন্ময় হইয়া উঠিবে তা তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। একদিন পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের শ্যামাসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কেমন যেন আবেগপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন স্বপ্নের মত দর্শন হইয়াছিল — একখানি মাটির চালা গৃহ। সেই গৃহের রান্নাঘরের মধ্য দিয়া একটি বিরাট বিল্ববৃক্ষ উঠিয়া গিয়াছে আর আমি রান্না করিতেছি; তথায় আর একজন রমণীকে দেখিলাম, তাঁহাকে আমার শ্বাশুড়ীমাতা বলিয়া বোধ হইল। আর সেখানে হঠাৎ আরেকজন সুপুরুষ মানুষ আসিলেন আর তাঁহাকে দেখিয়া তখন মনে হইল যে তিনি আমার স্বামী, তিনি আমার নিকট খাইতে চাহিলেন। তারপর দেখি, আমি তাঁহাকে যত্নপূর্বক খাবার পরিবেশন করিয়া খাইতে দিতেছি, তিনি প্রসন্ন চিত্তে খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেছেন এবং আমি তাঁহাকে হাত-পাখা দিয়া হাওয়া করিতেছি। তখন আমার শ্বাশুড়ীমাতা আসিলেন এবং পুত্রের সহিত স্নেহপূর্ণভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, আমি তখন ঘোমটা দিয়া সংযত হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম তারপর অন্য ঘরে চলিয়া গেলাম। একটু পরেই দেখিলাম আমি আবার ওই রসুইঘরে কাজকর্ম করিতেছি, তখন কে যেন আমায় পিছু হইতে ডাকিয়া বলিলেন — ''সর্বাণী! আজ পূজার আয়োজন রেখো, মায়ের পূজা করব।'' চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম! সেই সুপুরুষ মানুষটি তড়িৎ চলিয়া গেলেন। — আমার স্বপ্নভঙ্গ হইল। ভাবিলাম, এ সব কি? একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে পরে তখন মনে হইয়াছিল যে সুপুরুষ দীর্ঘকায় মানুষটিই হইলেন সেই শ্যামা সঙ্গীতগুলির স্রষ্টা কবিকঙ্কন শ্রীরামপ্রসাদ সেন।

কবিকঙ্কন শ্রীরামপ্রসাদ সেন

স্বাধ্বী জীবনে পরবর্তীকালে মুক্তেশ্বরের মহারাজজী একদিন আমায় রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, ''মাতাঠাকুরানী, তোমার পূর্বজীবনেও ঐ একই নাম ছিল তোমার, 'সর্বাণী'। আমি তোমার সেই হালিশহরেই গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরে থাকিবার জন্য মনস্থ করিয়াছি।'' — এ কথা শুনিয়াও আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

ছেলেবেলায় আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিলেন ভগবান শ্রীকিশোরী মোহন, তাই তখন আর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি অত আকর্ষণ অনুভব করি নাই। ভগবান কিশোরীবাবার জীবনী পাঠে জানিতে পারি যে ভগবান কিশোরীমোহনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুবার সাক্ষাৎও হইয়াছিল। 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবতে' আছে —'' শ্রীভগবানের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুরধূনী দেবীর দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ হয়। তাঁহাদের গৃহ কালীবাড়ীর নিকটে থাকায় শ্রীভগবান মধ্যে মধ্যে বোনের বাড়ী যাইতেন। সেই যাওয়ার সূত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।

পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় আছে জানিয়া অনেকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিত —'উনি ধুতি ও কোট পরে বাবুর মতন থাকেন, উনি কি প্রকৃত সাধু?' শ্রীশ্রীভগবান উত্তর দিতেন — 'হাঁ, সাচ্চা সাধু।' দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর ঘাটে নৌকা হইতে নামিয়া শ্রীশ্রীভগবান বোনের বাড়ী যাইতেন। একদিন পরমহংসদেব তাঁহার আসার সম্ভাবনা জানিয়া ঘাটে বসিয়া প্রত্যেক নৌকার ভিতর নুইয়া নুইয়া দেখেন। ইহাতে দেখা যায় শ্রীশ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল।''

ইহার পর একদিন রামকৃষ্ণদেবকে স্বপ্নে দেখিলাম। — 'মাটির বড় একটি খড়ের চালা ঘর। কক্ষমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথায় রহিয়াছেন এবং আমিও আছি। আমাকে তিনি বলিলেন 'বড় শীত করচে যে, আমায় কম্‌ফর্টারটা জড়িয়ে দাও তো।' — আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। ভাবিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও আমি? এ কি করে সম্ভব? ইহার দুই বৎসরের মধ্যে আমার ২০ বৎসর বয়সে তখন একদিন শ্রীশ্রীসরোজ বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই সময় একদিন রাত্রিকালে সাধনা করিবার সময় প্রথমে ঘর আলো করিয়া শ্রীভগবান আসিলেন, আসিয়া আমার সম্মুখে বসিলেন ও বলিলেন — ''আমায় সাজাইয়া দাও।'' আমি দেখিলাম আমার বিছানায় পাশে একটি বড় চন্দনের বাটি রহিয়াছে এবং সেটি হইতে চন্দন তুলিয়া লইয়া শ্রীভগবানকে সাজাইয়া দিতেছি। তখন হঠাৎ দেখিলাম, শ্রীভগবানের স্বরূপটি পরিবর্তিত হইয়া গিয়া তার পরিবর্তে শ্রীশ্রীসরোজবাবা আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন। তখন ঘর সুগন্ধে আমোদিত। আমি আশ্চর্য্য হওয়ায় তিনি স্মিত হাস্যে আমার হাত ধরিলেন। ইহাতেই আমার চমকভঙ্গ হইয়া গেল এবং স্থূল চেতনায় ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীসরোজবাবা

পরের দিন সরোজবাবা (সরোজবাবাকে তখন আমি 'বাবাজী মহাশয়' বলিতাম) আসিলেন এবং নানান আলোচনার ফাঁকে আমাকে বলিলেন, ''আমাকে একটি শ্রীশ্রীভগবান কিশোরীবাবার ফটো দিও।'' এই কথাটি শুনিয়াই আমি মনে মনে চমকিত হইলাম কারণ আমার কক্ষের পূজার আসনে শ্রীভগবানের একখানিই ফটো আছে আর শ্রীভগবানের ফটো তখন পাওয়া যায় না। আমি দোনো-মোনো করিয়া অবশেষে শ্রীভগবানের ফটোটি বাবাজী মহাশয়কে দিয়া দিলাম। — এইদিন হইতেই আমার জীবনে শুরু হইল সেই পরম পুরুষের লীলা প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্তে এবং প্রত্যহ।

শ্রীভগবান কিশোরীবাবা

তারপর আমার যোগদীক্ষা হয়, বিবাহ হয়, সন্তান হয় একটি এবং তৎপরেই সন্ন্যাস হয়। তারপর আমি সল্টলেকের গৃহে আসি। একদিন পূজা-ঘরের ধূলা ঝাড়িতে গিয়া দেখিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছোট্ট মূর্তিখানিতে ময়লা পড়িয়াছে তৎক্ষণাৎ উহা লইয়া বেসিনের কলে সাবান দিয়া ধুইয়া ঠাকুরকে গায়ত্রী মন্ত্রে স্নান করাইলাম। তৎপরে পূজার আসনে বসাইয়া (আমার আসনে প্রতিষ্ঠিত বাণলিঙ্গ - পরমশিব) বাণলিঙ্গ শিবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাথার উপরে একটি ছোট্ট নিখুঁত বিল্বপত্র দিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। সেইদিনই ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে দর্শনে দেখিলাম — একটি ভাঙা ইঁটখোলার, প্রাচীরের উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসিয়া আছেন আর তাঁহার দিব্য সমাধির আবেশ হইয়াছে এবং তিনি দিব্যভাবস্থ অবস্থায় বলিতেছেন — ''আমিই শিব, আমিই শংকর, আমিই রুদ্র!'' কালো কোট পরিয়া বসিয়া আছেন তিনি; সে কী অপূর্ব ভাব। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল এবং ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল। তখনও আমার দেহে কম্পন হইতেছিল। তারপর হইতে আমি সেই ছোট্ট বিগ্রহটিকে কাপড় পরাইয়া ভোগ নিবেদনপূর্বক জীবন্ত মানুষের মত নিষ্কামভাবে সেবা করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে তাঁহার তখন জন্মজন্মান্তরকে কেন্দ্র করিয়া অন্তরলীলা চলিতে লাগিল। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত সেই পরমপুরুষের নিরন্তর গভীর চিন্ময় স্পর্শে আমার অস্তিত্বের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে কালের মধ্যে এবং কালাতীত অবস্থায়।

''পরম পুরুষের নিরন্তর গভীর স্পর্শে,
কালবক্ষে ভাসিয়া চলি স্থির অন্তর হর্ষে।
তাঁহারে জানাই আমার হৃদয়ের আন্তরিক সমর্পণ,
কোটি কোটি প্রণামের সঙ্গে সবে লউক 'তোমার' শরণ।।''

— হরি ওঁ তৎ সৎ —

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (১৫)

শ্রীশ্রীদুর্গা

২এ, সিগরা
বেনারস
১৩-২-৪৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন যাবত আপনার পত্র পাই নাই। দীর্ঘ পত্র লিখিব লিখিব করিয়া আমিও এতদিন পত্র লিখিতে পারি নাই। আশাকরি বাড়ীতে সকলেই কুশলে আছেন।

এখানে প্রশান্তের অবতরণ অতি দ্রুতবেগে হইতেছে। এই অবতরণের সূচনা মুখে কিছু কিছু আভাস আপনিও শুনিয়া গিয়াছিলেন।

মরসত্তা ও অমরসত্তার যোগে এই অবতরণ সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পত্র মধ্যে লিখিয়া বুঝানো অসম্ভব। বিশ্বভেদ না করিলে বিশ্বাতীতে যাওয়া যায় না। বিশ্ব বলিতে এখানে দেহ বিশ্বই বুঝিতে হইবে। দেহবিশ্ব ভেদ করিতে না পারিলে বিরাট্ বিশ্বভেদ কি প্রকারে হইবে? এইজন্য এখন দেহভেদের ক্রিয়াই চলিতেছে। দেহভেদ সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ না হইলে যোগ সিদ্ধ হইতে পারে না। যোগ = মহাযোগ। এই মহাযোগ অবস্থাই অবতরণের প্রান্ত বিন্দু। তাহার পর মধ্য বিন্দু হইতে চারিদিকে কিরণ বিকিরণের ন্যায় মহাযোগের কেন্দ্র হইতে অনন্ত বিশ্বে শক্তি প্রবাহ বিকীর্ণ হইবে। যাহার ফলে ক্রমশঃ বিরাট্ বিশ্বভেদ সিদ্ধ হইবে, সমগ্র ব্যাপারের মূলে কালের সহিত সংঘর্ষ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত মহাযোগ অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কালকে আয়ত্ত করা সম্ভবপর হইবে না। কালকে আয়ত্ত করিতে পারিলে কালকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে। কালের বিনাশ ব্যতীত বিশ্বকল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে না। কাল আয়ত্ত হওয়া ও ধরাতলে পূর্ণব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি একই কথা। এখন পর্য্যন্ত সাধক ও যোগীগণের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারাও কালকে বদ্ধ করিতে পারা যায় নাই। তাহার জন্য যথোচিত চেষ্টাও হয় নাই। যাঁহারা জগৎ কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা কালের কবল হইতে জীবকে উঠাইয়া নিত্য জগতের ঊর্দ্ধমুখী ধারাতে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রকার চেষ্টা অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য তিনি সেই পরিমাণই উদ্ধার কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কাল এখন পর্য্যন্ত অধীনতা স্বীকার করে নাই — তাহার প্রভুত্ব অটুট রহিয়াছে। শত্রু মধ্য হইতে দুর্গ মধ্যে নিরাপদ স্থানে যাইয়া আত্মরক্ষা করাও যা কালের মধ্য হইতে নিত্যধামে যাইয়া স্থানলাভ করাও তাই। ইহাতে কালের প্রকোপ কমে না এবং কমে নাই এবং কমিবার আসাও নাই। তা ছাড়া এই প্রণালীতে সমগ্র জগতের উদ্ধার কার্য্য সম্ভবপর নহে, কারণ জীব সংখ্যা পরিমিত নহে, অনন্ত। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কথা আছে — প্রকৃত চৈতন্যের সঞ্চার এখনও কোথাও হয় নাই। সাধারণ জীব শত স্থানে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে ইহা কালের ঘের — উহা ভেদ হইতেছে না। এবং অসাধারণ জীবে অর্থাৎ যাঁহারা গুরুদত্ত কায়ার প্রভাবে শতভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা দ্রুত অথবা বিলম্বিত যে ভাবেই হউক স্রোতে বহিয়া বহিয়া ১০৮-এ আসিয়া পড়িবেন। ইহাও এক জাতীয় সুষুপ্তি। অনাদিকাল হইতে এখানে রহস্য সঞ্চিত হইতেছে — ভেদ হইতেছে না। কারণ অনন্তের অন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রহস্যের ভেদ কোথায়? — চৈতন্যের স্ফুরণাদি বা কোথায়! এইজন্যই স্থূলদেহে ১০৮ হওয়ার জন্য অথবা ১০৮ করার জন্য গুরুর এত আকাঙ্ক্ষা ছিল ও আছে। স্থূলে ৮ হইলেই ৯ অবশ্যম্ভাবী। কথা কিছুই বলা হইল না। শীঘ্র উত্তর দিবেন। পরে আবার বলিতে চেষ্টা করিব। যে ''দীর্ঘ পত্র কল্পনা রাজ্যে রচিত'' হইতেছিল, তাহা এখনও বাস্তবে অবতীর্ন হয় নাই, হইলে অবশ্যই পাইবেন।

পানু ভাল আছে। এখানে তাহাকে ৯০ টাকা দিব। শোভামা কলিকাতা ফিরিয়াছেন কিনা জানাইবেন। এখানকার কুশল। আপনাদের মঙ্গল সংবাদ পত্রোত্তর দিবেন।

ইতি— আপনার

শ্রীগোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই
শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের
সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

(২১)

প্রশ্ন : ''রাধা'' কে?

উত্তর : চৈতন্যধারার নিবৃত্তি রূপ হল ''রাধা''। যেমন ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত, সেইরূপ ''রাধা'' ব্রহ্মস্বরূপা নির্লিপ্তা ও প্রকৃতির পরস্থিতা। যেমন কার্য্যকারণে কালবশে ভগবান সগুণ হন, সেইরূপ কর্মদ্বারা কালে ''রাধা'' ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বরূপা হইয়া থাকেন। সেই পরমেশ্বর প্রাণ, রসনা, বুদ্ধি ও মনে প্রকৃতির সহিত স্বযোগবলে সম্পর্ক করিয়া থাকেন। কালে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। ভগবানের ন্যায় তিনিও অকৃত্রিমা, নিত্যা ও সত্যস্বরূপা বলিয়া 'ভগবতী' নামে অভিহিত হয়েন। প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই ''রাধা'' বলে। রসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সরস্বতী; দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই হিমালয় কন্যা ''পার্বতী'' হইয়াছেন। তিনি সকল দেবতাগণের তেজে অধিষ্ঠান করেন, সকল দৈত্যগণের সংহারকারিণী এবং দেবতাদিগের শত্রুবিনাসিনী। তিনিই সকল দেবতাদিগকে স্থান প্রদান করেন। তিনিই জগদ্ধাত্রীরূপে ত্রিজগতের ধাত্রীরূপা, ক্ষুৎ পিপাসা, দয়া, নিদ্রা, তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষমা রূপা। তিনি লজ্জা ও ভ্রান্তি স্বরূপা এবং সকলের অধিদেবী, মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্রাহ্মণদিগের সাবিত্রী। তিনি রাধার বামাংশ সম্ভূতা মহালক্ষ্মী নামে পরিচিতা। মহালক্ষ্মী দেবী বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানের পত্নী, তিনিই নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাপত্নী হইয়া 'সাবিত্রী' নাম ধারণ করিয়াছেন। পূর্বে বৃন্দাবনে রাসের অধিষ্ঠাত্রী পরিপূর্ণতমা 'দেবী সতী' স্বয়ং রাসের ঈশ্বরী হন। তিনি রাসমণ্ডল মধ্যে রাসক্রীড়া করেন এবং 'রাধিকা' নাম গ্রহণ পূর্বক পরিপূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাশে নিত্যারূপে অবস্থান করেন। দুগ্ধ ও দুগ্ধধার স্তন যেমন আধার আধেয় ভাবযুক্ত, কৃষ্ণ ও রাধার সম্বন্ধও তদ্রূপ। যোগমায়া পরিচালিত লীলার নিমিত্ত কৃষ্ণ হন পুরুষোত্তম পরম এবং রাধা হন প্রকৃতি পরমা। কৃষ্ণাঙ্গ হইতে শ্রীরাধা সমুদ্ভূত হইয়াছেন এবং 'রাধা' হইতে অন্যান্য 'দেবী'র উদ্ভব সাধিত হইয়াছে। প্রণবাদ্যা মহামায়া রাধার মহিমা অনন্ত, বাক্যদ্বারা ইহা ব্যক্ত করা সম্ভব নহে।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

(২২)

প্রশ্ন : ''ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, প্রিয়ণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে, বসো মম।''—এই মন্ত্রের অর্থ কি?

উত্তর : এটি যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রের শব্দার্থ হল — (গণানাম্) অর্থাৎ, গণগণের মধ্যে তোমাকে (ত্বা) গণপতিকে (গণপতিম্) আবাহন করি (হবামহে)। প্রিয়গণের মধ্যে তোমাকে অর্থাৎ প্রিয়পতিকে আবাহন করি। (নিধীনাম্) অর্থাৎ, নিধিগণের মধ্যে তোমাকে, নিধিপতিকে (নিধিপতিম্) আহ্বান করি। হে বসু রূপ পরমেশ্বর, তুমি আমার পালক হও (বসো মম)।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অভিলাষ

নাইবা দিলে চরণ ধূলি
এই মাথে,
নাইবা প্রভু রইলে তুমি
মোর সাথে
তবু তোমায় রাখব আমার
হৃদয়-মাঝে—
জানবে না কেউ রইবে রাখাল
রাজার সাজে।

নয়ন পাতে নাইবা তুমি
দিলে দেখা,
নয়ন বুঁজে দেখব তোমায়
একা একা।
দুই নয়নের অশ্রুটুকু
সঙ্গোপনে—
'হৃদয়-হরণ', তোমায়
দেব ঐচরণে।।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীগুরুদাস আশ্রম

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (১৫) : একদা রাত্রি দশটা; শ্রীশ্রীবাবাকে গুরুমা (শ্রীশ্রীবাবার স্ত্রী) মুগের ডাল ও তিনটি রুটি রাতের খাবার দিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীবাবা খেতে বসেছেন। সেখানে আছে অসীমদা, গোপাল ও গৌর। হঠাৎ বাবা ডালের বাটিটা সজোরে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারলেন। দেওয়াল কিছুটা চটে গেল এবং কিছু মুগের ডালের দানা লেগে রইল।

পরের দিন সকালে বেহালা থেকে গাড়ী করে মাণিক, বুটা (মাণিকের ভাই) বুটার বউ এসে উপস্থিত হলো। এরা সবাই বাবার পরম ভক্ত। তারা সঙ্গে করে বুটার বউয়ের সেই শাড়ীটি নিয়ে উপস্থিত যেটা হঠাৎ কাঁচি দিয়ে মাঝখান থেকে কেটে দিলে যা হয় এবং তাতে কিছু মুগের ডালের কণা লেগে রয়েছে। তাছাড়া ওরা ওগুলি শ্রীশ্রীবাবাকে দেখাতেই অসীমদার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘটনাটি হলো — আগের দিন রাত্রে ওদের স্বামী এবং স্ত্রীর ঝগড়া এক ভয়ঙ্কর রূপ নেয় এবং বুটার বউ মাথা ঠিক রাখতে না পেরে বাবার নাম করে নিজের শাড়ী গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ে। এদিকে অন্তর্যামী শ্রীশ্রীবাবা সঙ্গে সঙ্গে ডালের বাটি ছুঁড়ে কাপড়টাকে কেটে দেন এবং বুটার বউ মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসে।

প্রসঙ্গ (১৬) : কোনও এক রবিবার সকালবেলা আমরা শ্রীশ্রীবাবার নিকট বসে আছি, এমন সময় রামরাজাতলা শঙ্কর মঠের পিছনে মুখার্জী পাড়া থেকে দুইজন ভদ্রমহিলা একটি ১০-১২ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। এদের পাঠিয়েছিলেন শ্রীকালোবরণ লাহিড়ী, যিনি শ্রীশ্রীবাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং বাবার যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। ছেলেটির একটি চোখে গ্লুকোমা হয়ে চোখটি এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল যে ডাক্তার বলেছিল সেটি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্য চোখটির অবস্থাও খুব খারাপ। সেই দুজন ভদ্রমহিলার মধ্যে ছেলেটির মা শ্রীশ্রীবাবার কাছে খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাবা ভাবস্থ হয়ে তাদের মাঝে মাঝে দেখছেন, আবার পরমুহূর্তেই ভাবস্থ হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছেন। তারপর শ্রীশ্রীবাবা হঠাৎ ছেলেটির মাকে বললেন যে, ''মা, তোমাদের তো টালির চালের বাড়ী এবং বাড়ীতে একটা লাউ গাছ আছে। লাউগাছটি টালি ছেয়ে আছে; সেই লাউ গাছে অনেক সাদা সাদা ফুল ফুটেছে। তুমি সেই লাউ ফুল চট্‌কে একটু রস বার করে ছেলেটির দুচোখে কয়েকদিন দিয়ে দেবে। দেখবে চোখ ঠিক হয়ে গেছে।''

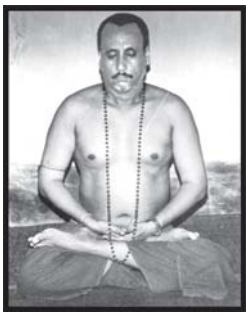

কয়েকদিন পরের কথা — তারা শ্রীশ্রীবাবার কাছে এসে জানালেন যে তাদের ছেলের চোখ একদম ঠিক হয়ে গেছে এবং ডাক্তারবাবুও আশ্চর্য্য হয়ে বলেছেন যে চোখ দুটি একেবারে সুস্থ।

এই ঘটনায় শ্রীশ্রীবাবাকে আমরা জিজ্ঞাসা করাতে তখন বাবা বলেছিলেন যে ওদের কথা শোনা মাত্র বাবা ছেলেটির চোখ দুটি সারিয়ে দিয়েছিলেন। তবে ওরা সাধারণ মানুষ, ওদের রোগ সারানোর একটা মাধ্যম দেখাতে হবে, তাই ওই লাউফুলের রস দিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন তিনি। ওটা একটা কথার কথা মাত্র (শ্রীশ্রীবাবার ভাষায় - ''লাউ ফুলের রসের কোনো ব্যাপার নয়, ওটা একটা বলার বলা মাত্র, যা ভাল করবার আমি তা ওদের কথা শোনামাত্রই ভাল করে দিয়েছি। ওদের কোন একটা অজুহাত দেখাতে হবে তো, তাই'')।

...ক্রমশঃ

—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠান

বুদ্ধ পূর্ণিমা — ৪ঠা মে, সোমবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৮শে জুন, রবিবার
গুরু পূর্ণিমা — ৩১শে জুলাই শুক্রবার

তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হলে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন। **—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব**

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২২)

শ্রীমা এসে পড়লেন। রাণীমা জিজ্ঞাসা করলেন—''আপনার জন্য একটু মিছরীর সরবৎ করে দেব? অনেকক্ষণ এসেছেন এখানে; যেদিন আসেন, সেদিন আবার শুনেছি, কিছু না খেয়েই আসেন। পুজো শেষ হতে তো এখনও দেরী আছে। ওঁর গঙ্গাস্নান করতেই কত ঘন্টা লাগবে—

যাও না বাপু তাড়াতাড়ি সেরে এসো না — তোমার পূজা শেষ না হলে হয়তো উনি কিছুই স্পর্শ করবেন না।''

রামকৃষ্ণদেব হাসিমুখে দাঁড়াবার সময় বলে উঠলেন — ''ঐ দেখ মা ভবতারিণীও ওত পেতে দাঁড়িয়ে বলছেন — স্নান সেরে আয়।''

রামকৃষ্ণদেব উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণীও উঠে দাঁড়ালেন আর শ্রীমাকে বললেন—''চলুন আপনার ঘরে, আপনার জন্যই আমি নিজে মিছরীর সরবৎ করে আপনাকে খাইয়ে প্রসাদ নি—মথুর বাবুকে বল নরেন, আমি এখনই সারদা-মায়ের ঘর থেকে আসছি। তুমি কি এখন কিছু ফলটল খাবে? আসবার সময় অনেকগুলো আম, কলা ও পেঁপে এনেছি।''

(এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে সিদ্ধান্ত ঠাকুর তাঁহার মহাভাবময় দিব্য দৃষ্টিতে রানী রাসমণি বলিয়া যাঁহাকে বলিতেছেন সম্ভবতঃ, তিনি আসলে মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা দেবী, রানী রাসমণির কন্যা, যাঁহার চেহারা ও দৈহিক গঠন অনেকটা রানী রাসমণির মত ছিল। এঁনারই সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সখীভাবে সাধন করিতেন।—শ্রীশ্রীমা)

নরেন উত্তর দিলেন-''না রাণীমা ওসব পূজার জন্যে এনেছেন। মন্দিরে যা কিছু আসে, তা পূজা উৎসর্গ না হলে বোধহয় নিতে নেই। আমি এইমাত্র গঙ্গাজল খেলুম। এখন আর কিছুই দরকার নেই। আপনি আসুন, আমি মথুরবাবুকে জানিয়ে দিই।''

শ্রীমা কোন কথাই আর বলতে পারলেন না; রাণীমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

রাণী রাসমণি প্রশ্ন করলেন—''আপনাকে উনি দেবী বলেই পূজা করেন কখনও কি স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারেন না?''

শ্রীমা বললেন, ''আমি ঠিক তা বুঝতে পারি না ঘুমের পরে কোন কোন দিন দেখি ও আমার পয়ের তলায় শুয়ে পড়ে মা-মা বলে কাঁদছে আবার কোন দিন দেখি আমার ঘুমন্ত অবস্থায় কপালে চুমা দিচ্ছে। আমার ঘুমের ঘোর সে সময় এত প্রবল হয় যে আমি ওর কাজের কোন জবাব নিতে পারি না। আমার তখন কী যে হয় তাও বোঝাতে পারি না।''

রাণী রাসমণির ইঙ্গিত ও প্রশ্ন প্রায় একটু ঘোরাল হওয়ায় শ্রীমা উত্তর দিলেন— ''ঘুমের ঘোর ভাঙতেই কোন কোন দিন দেখি আমার বুকের উপর একরাশি পদ্মফুল, আর স্বামীগুরু পাশেই ঘুমের ঘোরে অচেতন। ভয়ের চোখে উঠে বসে তাঁকে জাগিয়ে তুলতেই, চোখ না চেয়েই বলে উঠল—'কে? মা। এই যে যাচ্ছি'। চোখ চেয়ে মুখ মুছে বললেন—'আমি তোমার বিছানায় কি করে এসে পড়লাম? এত পদ্মফুল কোথা থেকে এল? এসব ত আজ রাণীমা মায়ের চরণে দিতে পাঠিয়েছিলেন। সেই ষোলটা পদ্মই বা তোমার পায়ে এল কী করে'? এসব বলতে বলতে কোন কোন দিন এত কাঁদতে বসল যে আমিও সাথে সাথে চোখের জল ফেলতে লাগলুম। এমনি ভাবে সমস্থ রাত্রিটাই হয়ত কেটে গেল। তাই বলছি স্বামী গুরুর কাজ কর্ম্মের কোন হিসেব নিতে পারব না। আমি নিজেও বুঝি না, অন্যকে আবার বোঝাতে পারি না।''

ঠিক এই সময়ে নরেন ও মথুরবাবু এসে বলতে লাগলেন, ''ঠাকুর মশায়ের গঙ্গাস্নান তো দেখতে পেলে না, কতরকম উপুড় হয়ে, চিৎ হয়ে, মাথাটা জলের তলায় রেখে, আর পা-দুটো উপরে রেখে অনেকক্ষণ ধরে মা গঙ্গাকে মুদ্রা দিয়ে পূজা করতে করতে, কোথায় যে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আমরা কূলকিনারা পেলুম না। যেই আপনাদের ডেকে আনবার বাসনা জাগল, অমনি দেখি তিনি মাঝ গঙ্গায় ভেসে উঠলেন—ওঁর কার্য্যকলাপ বা পূজা পদ্ধতি সবই যেন বেদ বেদান্তের বাইরে। আরও অনেক ব্যাপার হয়ে গেল। এখন ওসব কথা থাক, আসুন উনি পূজার ঘরে এসে পড়েছেন। আজ আবার এত কাঁদছেন যে, ওঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করবার সাহস পাচ্ছি না। সারদা-মা তুমিও এসো।''

সারদা মা, চোখ মুছতে মুছতে বললেন—''হাঁ-হাঁ, আমিও রাণীমার সাথে যাব, তোমরা একটু করে তৈরী মিছরীর সরবৎ খেয়ে যাও।''

প্রসাদ পেতেই, মন্দিরে নহবৎ বেজে উঠল। সকলেই জলভরা চোখে পূজার ঘরে এসে দাঁড়ালেন। *...ক্রমশঃ*

ভ্রমণ

কাশীধামে পঞ্চক্রোশী

(৩)

আমাদের পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার পথে প্রথমে পড়েছিল কেন্দুয়া গ্রামের মধ্যে বহু পুরাতন শিবমন্দির যা 'কর্দমেশ্বর মহাদেব' নামে খ্যাত। মন্দিরের পাশেই রয়েছে তখনকার দিনের বাঁধানো একটি পুকুর (তালাও)। আমরা সকলে মন্দিরে প্রবেশ করে শৈব্যতীর্থ পরিক্রমার প্রথম শিবলিঙ্গ (মহাদেব) দর্শন করি। প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত মহাদেব মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে, পুকুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এবং সেই কোলাহল মুক্ত শান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে পুণ্যস্থানের কিছুটা আত্মিক আনন্দ উপলব্ধি করি। এরপর রওনা দিই পরবর্তী তীর্থস্থানের দিকে। যতদূর জানা যায় 'কর্দমঋষির' তপস্যার স্থান ছিল এখানে এবং এই শিবলিঙ্গটি তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠিত। গাড়ী ছুটতে ছুটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসে 'ভীমচণ্ডী' মন্দিরের কাছে। গাড়ী থেকে নেমে প্রাচীন মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তার কারুকার্য্য দেখতে দেখতে প্রবেশ করি ভীমচণ্ডী মাতার দর্শনের জন্য ও যেখানে প্রতিষ্ঠিত এবং নিত্য পূজিত শিবলিঙ্গ রয়েছেন, তাঁদের দর্শন ও প্রণাম জানিয়ে মন্দিরখানি পরিক্রমা করে বেরিয়ে আসি গাড়ীর কাছে। পরবর্তী তীর্থস্থান কাছেই থাকায় গাড়ীর ড্রাইভার অল্পক্ষণের মধ্যেই নিয়ে আসে 'ভৈরনাথ' মন্দির দর্শনে। শৈব্যতীর্থ কাশীধামে বিভিন্ন স্থানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন নামে শিবলিঙ্গের (মহাদেবের) প্রতিষ্ঠিত মন্দির রয়েছে তেমন, তাঁদের পাহারাদার হয়ে এই ধামকে ঘিরে রয়েছেন ভৈরবদেবগণ। প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম মন্দির, তাতে ভৈরনাথজী পূজিত হয়ে চলেছেন কত যুগ ধরে তা কারো জানা নেই। সেখানে দর্শন করে প্রণাম জানিয়ে ও মন্দির পরিদর্শন করে, পাশেই অবস্থিত পুকুর যা 'ভৈরতালাও' নামে পরিচিত সেখানে এসে দাঁড়াই। গুরুগম্ভীর মন্দিরের পরিবেশের বাইরে সুশীতল হাওয়ার আনাগোনা ও গ্রামীন পরিবারগুলির সাধুদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পুকুর পাড়ে এসে পৌঁছায়। স্বল্প তীর্থযাত্রীদের মন্দিরে বাজানো ঘন্টার ক্ষীণ আওয়াজ ছাড়া ভৈরতালাওয়ে কিছু শোনা যাচ্ছিল না। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে ফিরে আসি মন্দিরকে স্পর্শ করে দরজার বাইরে। প্রত্যেক মন্দিরে প্রণামী দিলেও সেখানে দরজার পাশেই ছিলেন এক সাধক, প্রণাম জানিয়ে তাঁর হাতে কিছু দান দিতে ভুল হয় নি আমাদের। চলতি পথে পাশের গ্রামেই রয়েছে সৃষ্টিকর্তা 'শ্রীশ্রীব্রহ্মাজীর' প্রাচীন মন্দির ও তার ভিতর রয়েছে শিবক্ষেত্রের প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীন কাল হতে পূজিত একটি শিবলিঙ্গ। এছাড়া সেখানে রয়েছে মহাভারতের পাণ্ডব বংশেরই রাজা পাণ্ডুর মধ্যম বীরপুত্র 'ভীমের' মূর্তি সহযোগে মন্দির। এখানেও আমরা প্রাচীনত্বের ছাপ পাই মন্দিরের কারুকার্য্যে। সকলে প্রণাম সহযোগে মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে আসি। প্রাচীন তীর্থস্থান কাশীধামে দেব-দেবীদের আগমনের বার্তা পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার মাধ্যমে আমরা অনেকটাই জানতে পারি। শিবরাত্রিতে বহু সাধু-সন্তগণ পায়ে হেঁটে এই পরিক্রমা করে থাকেন, তারপর পবিত্র গঙ্গাস্নানের মাধ্যমে গঙ্গাজলস্থ দুধ, দই, মধু এবং সিদ্ধির মিশ্রণ (যাকে পঞ্চামৃত বলা হয়) ও বিল্বপত্র সহযোগে বাবা বিশ্বনাথজীর পূজা দেন। আমাদের গাড়ী পরবর্তী তীর্থস্থান 'কামেশ্বর মহাদেবের' মন্দিরের পথে যাবার জন্য ছুটে চলেছিল। অনেক ঘন্টা যাবৎ গাড়ীর ঝাঁকুনির ফলে পেটে খিদের সঞ্চার হয়ে যায়। পথে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী তীর্থস্থান দর্শনের পরে, পথেই কিছু খাওয়া হবে। মিনিট পনের বাদে আমরা চলে আসি মন্দিরের সীমানায়। সেখানে কামেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পাশাপাশি রয়েছেন সিদ্ধিদাতা 'গণেশজীর' মন্দির, 'শীতলা' মায়ের মন্দির ও সংকটমোচনকারী বীরহনুমানজীর মন্দির। সেই কামেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে প্রতি সোমবার প্রচুর ভীড় হয়ে থাকে, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসা ভক্তগণের সমাগমের ফলে। আমরা প্রত্যেকটি মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে এসে যখন গাড়ীতে উঠে বসি তখন, কবির কথায়— 'বেলা বয়ে যায়' — এইরূপ পরিস্থিতি দেখে সুদক্ষ গাড়ীচালক শীঘ্রই সতর্কতার মাধ্যমে আমাদের নিয়ে চলে আসে 'কালভৈরব' ও তৎসহ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের নিকট। সেই যাত্রাপথে পূর্বে পেয়েছিলাম আরও একটি ভৈরব মন্দির যা পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় 'কালভৈরব' নামেই অবস্থিত। তার একটু পাশেই 'লক্ষ্মীনারায়ণের' মন্দির। পুরোহিত মহাশয় পূজা সমাপ্ত করে দরজায় তালা দিয়ে চলে যান, তাঁর নিত্য কর্মসূচী অনুযায়ী। কিন্তু, সেই তীর্থে ভগবান এতই দয়াময় যে, তীর্থযাত্রীদের প্রতি দর্শন দেবার নিমিত্ত মন্দিরের প্রাচীন কাঠের দরজায় এমন একটি ফুকর তৈরী করে রেখেছেন, যা সকলের দর্শনের পক্ষে সুবিধাজনক। আমাদেরও দর্শনে কোনই অসুবিধা হয়নি। বহু পুরাতনের ছাপ মন্দিরে থাকলেও সেখানে শান্তি বিরাজের

ফলে ঈশ্বরানুভূতির স্পর্শ পাওয়া গেল। তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য তীর্থস্থানে আসলেই বোঝা যায়, দূর থেকে তা অনুধাবন করা বড়ই মুশকিল। গ্রামের মধ্যে মন্দিরগুলির অবস্থান হলেও ঈশ্বরের টানে ভক্তের আনাগোনায় বিরাম নেই। কাশীধামে তীর্থ করতে আসা ষড়ঋতুর শীতকালের বিদায়লগ্ন চলে আসায় ও ঋতুর পরিবর্তনের ফলে, দেবতার দরবারে বসন্তের স্থান প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার হতে থাকে। যারফলে সূর্য্য কিরণে তাপের সঞ্চার, বৃক্ষ হতে ঝরে পড়া পাতার জমায়েত, সাথে হাল্‌কা বসন্তের হাওয়াও উপলব্ধিত হয়। আমরা সকলে এই স্থানেই রাস্তার পাশে কিছু খাবার ও চা গ্রহণ করেছিলাম। তারপরে রওনা দিই 'রামেশ্বর মহাদেবের' মন্দিরের পথে। বেশ কিছুটা পথ যাবার পর মন্দির অঞ্চলে গাড়ী উপস্থিত হয়। সেখান থেকে নেমে চলে যাই মন্দির প্রাঙ্গণে। সেখানে ছোট ছোট অনেক দেব-দেবীদের মন্দিরের সাথে রয়েছেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের হাতে প্রতিষ্ঠিত 'রামেশ্বর মহাদেব'। এখানে প্রশ্ন হল, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সেখানে উপস্থিতির কি কারণ? মন্দিরের ভিতর সুন্দরভাবে পিতলের পাত দিয়ে মোড়া শিবলিঙ্গ ও তাঁর বেদীখানিতে সেখানের পুরোহিত মহাশয় আমাদের মন্ত্রপাঠ পূর্বক পূজা দেওয়ান। একটু পাশেই মহাদেবের হোমকুণ্ড হতে বিভূতি নিয়ে আমাদের হাতে দেন এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তরে মন্দিরের একটি প্রাচীন কাহিনী শোনান যা হল, ত্রেতা যুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান। ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ও শিবের পরমভক্ত এবং উপাসক, লঙ্কার রাজা রাবণকে হত্যা করার পর বিবেকজনিত চিন্তা ও পরবর্ত্তী কর্মফল হরণের উদ্দেশ্যে তিনি কাশীধামে উপস্থিত হয়ে, এই পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার পথে বরুণা নদীর তীরে মন্দির স্থাপন করে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে নিজ হাতে পূজা করেন। সেই থেকে এই শিবলিঙ্গের নাম হয়ে থাকে 'রামেশ্বর মহাদেব'। পরে সেখানে নাটোরের রাণী ভবানী কাশীধামে থাকাকালীন একটি সুন্দর 'মা দুর্গার' মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, যা আজও নিত্য পূজিত হয়ে চলেছে এবং নবরাত্রে উৎসবের ধুম পড়ে যায়। পাশেই আছেন কালো পাথরের 'কড়িমাতার' মূর্তি। পুরোহিত মহাশয়ের কথায় এই মূর্তিখানি সেই পুণ্যভূমি থেকে উত্থিত হয়েছেন স্বয়ং নিজেই, তা জানতে পারি। পরস্পর পাশাপাশি ভাবে দুই দেবী সেই মন্দিরে পূজিত হন। আমরা মন্দিরগুলি দর্শন করে বরুণা নদীর তীরে বাঁধানো ঘাটে গিয়ে হাতে জল নিয়ে আচমন করি ও নদীর দু-পারের প্রাকৃতিক দৃশ্যের আনন্দে কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে যাই। *...ক্রমশঃ*

—স্বামী সংবেদানন্দজী

ভগবান স্বপ্রকাশময়

কৃষ্ণ কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালে একদিন নন্দালয়ে যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইতেছিলেন, তখন কতিপয় বৃদ্ধা ও বালিকা গোপিকা নন্দগৃহে আসিলেন। মাতা যশোদা তাঁহাদিগকে দেখিয়াই পুত্রকে শয্যায় শয়ন করাইয়া গোপিকাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শিশু শ্রীকৃষ্ণের তখনও স্তন্যপানে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই; তিনি ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া পদযুগল তাড়ন করিতে লাগিলেন। শিশু কৃষ্ণের পাদ তাড়নে নিকটস্থ একটি শকট ভূপতিত হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল এবং শকটের উপরে রক্ষিত দধি, নবনীতাদির ভাণ্ডসমূহও ভূপতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। ইহা দর্শনে সমাগত গোপিকাগণ ভয়ভীত ও অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যশোদাকে শকট ভগ্ন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যশোদা যখন বলিলেন যে তাঁহার পুত্রের পদাঘাতে শকট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা যশোদার কথা সম্যক বিশ্বাস না করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর এই কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। তখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া স্বস্ত্যয়ন কর্মাদি করিয়া শিশুর হস্তে এক সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ কবচ বন্ধন করিয়া দিলেন।

জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতম অবতার তথাপি মায়িক জগতে মায়ার এমনই প্রভাব যে বেদ-বেদান্ত পারঙ্গম ব্রাহ্মণেরাও ভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রকাশকে প্রথমে বুঝিতে সক্ষম হন নাই। ভূভার হরণ করিবার জন্য বসুন্ধরার অনুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই তো সর্ব্বমঙ্গলময় ও সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ; তাঁহার মঙ্গলের জন্যে আবার কবচের কি প্রয়োজন ছিল? শিশুর মধ্যে অশুভশক্তির প্রভাবের আশঙ্কায় অথবা অন্যভাবে শিশুর যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয় সে কারণে ব্রাহ্মণগণ হয়তো সর্বমঙ্গলপ্রদ কবচ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবৎলীলা সকলে অবগত হইতে পারেন না। একমাত্র সেই পরমের অসীম অনুকম্পা না হইলে অথবা ভগবৎকৃপা এবং ভগবৎ-ইচ্ছা বিনা ভগবানের স্বরূপ কেহ অবগত হইতে পারেন না।

(সহায়ক গ্রন্থ 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ')

মহর্ষি শ্যাবাশ্ব

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অত্রিবংশীয় মহর্ষি শ্যাবাশ্ব ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মরুদ্‌গণেরই (মরুদ্‌গণ কশ্যপ ও দিতির পুত্র, দেবতুল্য শক্তিমান দেবতাগণ, ইঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের সভা অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থান করেন।) স্তব করিয়া বহু ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ইহা ভিন্ন অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাগণের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন।

মহর্ষি শ্যাবাশ্ব সম্বন্ধে সায়নাচার্য্য একটি উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছেন। — শ্যাবাশ্বের পিতা অর্চনানা ঋষি একবার দর্ভ-তনয় রাজা রথবীতির যজ্ঞে পুরোহিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্যাবাশ্বও ঐ যজ্ঞকালে পিতৃ সমীপে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় অর্চনানা নৃপ রথবীতির কন্যাকে পুত্র শ্যাবাশ্বের পত্নীরূপে রাজসমীপে প্রার্থনা করেন। এই প্রস্তাবে রথবীতি রাজী হইলেও রথবীতির মহিষী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে তাঁহাদের সকল কন্যারই ঋষিদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এস্থলে শ্যাবাশ্ব যখন ঋষিত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন তাহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহ সম্ভব নহে। রাজসভায় এইভাবে পিতার অপমান হইলে পরে শ্যাবাশ্ব তখন সকল কিছু অবগত হইয়া রাজকুমারীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি একবার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে রাজা তরন্ত বা তরণ্ড ও তাঁহার মহিষী শশীয়সীর নিকট হইতে গোমুখ, আভরণ ও বহুমূল্য রত্নাদি লাভ করেন। অনন্তর শ্যাবাশ্ব শসীয়সীর পরামর্শে তাঁহার অনুজ পুরুমীল্হের নিকট গমন করেন। গমন করিবার কালে পথিমধ্যে তিনি মরুদ্‌গণের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহাদের স্তব করিয়া সন্তুষ্ট করিলে মরুদ্‌গণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ‘ঋষি’ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করেন। তদবধি তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া পরিচিত হইলেন। অতঃপর ঋষি শ্যাবাশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল।

মহর্ষি শ্যাবাশ্ব অত্রিবংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষিগণের অন্যতম আর্ষের প্রবর।

(সহায়ক গ্রন্থ -ঋক্‌বেদ - ৫-৬১ টীকা ও মৎস পুরাণ)

গীতা ভাবনা

(২১)

ইন্দ্র প্রথমো মনস্বান্ বলে অন্তর্যামী পুরুষ। তিনি ভয় থেকে সকলকে অভয়ের পথে নিয়ে যান — ‘যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি’ (ঋক্ সং ৮/৬১/৩১)। ইন্দ্রকে সারথি রূপে রথে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথাও বলা হয়েছে বেদে। নিরুক্ত মতে ইদি পরমৈশ্বর্য্যে ধাতু থেকে ইন্দ্র পদটি গঠিত। তিনি ঐশ্বর্যবান। যাদের পক্ষে তিনি থাকেন তারাই জয়লাভ করে। গীতা মাহাত্ম্যের কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে—

‘*যত্র যোগেশ্বরো কৃষ্ণঃ যত্র পার্থঃ ধনুর্দ্ধরঃ।*
যত্র শ্রীবিজয়ো ভূতি ধ্রুবানিতি মতির্মম।।’

গীতার কৃষ্ণ আর বেদের ইন্দ্রের মিল দেখাবার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করছেন পণ্ডিতেরা।

রথের সুসারথির কথা গীতার মত বেদেও উচ্চারিত হয়েছে। ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষির দ্বারা একটি মন্ত্র এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উচ্চারযোগ্য —

‘*রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুসারথিঃ।*
অভীশূনাং মহিমানং পণায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ।।’
(ঋক্. সং. ৬/৭৫/৬)

অর্থাৎ—‘সুসারথি রথে অবস্থান করে সামনে অবস্থিত ঘোড়াদের যেখানে যেখানে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে সেখানেই নিয়ে যায়। রশ্মিগুলি ঘোড়ার পিছন থেকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের মহিমার স্তব কর।’ মন তাদের মহিমার স্তব করবে। এই মন হল ইন্দ্রিয়পতি মন। এই মনের পিছনে যে আর একটি মন আছে তা বিশ্বমন। অন্তর্যামী সেই বিশ্বমনকে বা বিজ্ঞানঘন শুদ্ধমনকে অন্তর্যামী সারথি হিসাবে কল্পনা করে যজুর্বেদের শিব-সংকল্প সূক্তে বলা হল—

‘*সুসারথি-রশ্বানির যন্মনুষ্যান্ নেনীয়তে অভীশুভির্বাজিন ইব।*
হৃৎপ্রতিষ্টাং যদ্ অজিরং জবিষ্ঠং তমে মনঃ
শিবসংকল্পমস্তু।।’ (শুক্লযজুঃ ৩৪/৩)

অর্থাৎ — ‘সুসারথি ঘোড়াদের যেমন চালনা করে নিয়ে যায়, বল্গা আকর্ষণ করে, তেমনি যে মন মানুষদের যেখানে সেখানে চালিয়ে নিয়ে যায়, আবার বল্গা টেনে রাখে, যে মন

হৃদয়ে স্থিত, জরাহীন এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী আমার সেই মন শিবসংকল্পযুক্ত হোক'।

গীতা যদি অন্তঃসংগ্রামের রূপক হয় তাহলে ঘোড়া, রথ, ঘোড়াকে টেনে ধরা ইত্যাদি অবশ্যই স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি একথা মানতে হবে। রথ, সারথির রূপক কঠোপনিষদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। সেই জায়গাগুলি আলোচনা করলেই গীতার রূপকটি কিভাবে সংহিতা থেকে উপনিষদের স্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল তা পরিস্কার হবে।

'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুমনীষিণঃ।।
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইত সারথেঃ।।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।।

(কঠোপনিষদ্ ১/৩/৩-৬)

অর্থাৎ, জীবাত্মাকে রথের মলিক এবং শরীরকে রথ বলে জানবে, বুদ্ধিকে রথের চালক এবং মনকে লাগাম বলে জানবে।

জ্ঞানীরা ইন্দ্রিয়সমূহকে ঘোড়া, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে ঘোড়াদের গমনের পথ বলে জানেন; তারা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত জীবাত্মাকেই ভোগকর্তা বলে থাকেন। কিন্তু যে বুদ্ধি অসমাহিত মনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিবেকহীন হয়, তার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির দুষ্ট ঘোড়ার মত দুর্দমনীয় হয়। কিন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা সমাহিত মনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিবেকবান্ হয়, তার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির সুসংযত ঘোড়াগুলির মত আজ্ঞাধীন হয়ে থাকে। *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বজননী দেবী সারদামণি

ঋষি বশিষ্ঠ, পত্নী দেবী অরুন্ধতী সহ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন পতিত জীবকে সৎ-মার্গ প্রদর্শন করাইতে, সঙ্গে আনিয়াছেন আপন মণ্ডলীর সন্তানতুল্য ঋষিগণকে লীলাপার্ষদ রূপে। কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যভূমিতে তাঁহারা দুইজনে সপার্ষদ আসিয়াছিলেন। অপূর্ব লীলা রচনার দ্বারা বহু মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সর্বত্যাগী সন্তানগণ দ্বারা গঠিত মঠের ভাবধারা আজও বহু মুমুক্ষু মানুষকে শান্তির পথে পদচারণা করিতে শিখাইতেছে। ঠাকুর যদি হন সংঘের প্রাণপুরুষ, মাতা সারদামণি হইলেন চালিকা শক্তি, দুইয়ের প্রেমসঙ্গীতের যুগলবন্দী সমগ্র বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে।

ত্যাগী সন্তানগণকে সাধনভূমির উচ্চতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই ঠাকুর চলিয়া গিয়াছিলেন। পরন্তু মা সারদা তাহাদের হস্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া উদ্দিষ্ট জগৎকর্মে সঙ্গ দিয়াছেন। প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছে সন্তানগণের মস্তকে। স্বামীজী আমেরিকা যাত্রা পূর্বে মা তাঁহাকে পত্রে লিখিয়াছিলেন —''তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো, তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।'' সমগ্র ভারত জানে মায়ের এই আশীষ বচন বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে স্বামীজী কোন এক গুরুভাইকে পত্র লিখিয়াছিলেন —''মা-ঠাক্‌রুণ যে কি বস্তু বুঝতে পারনি, ...ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগৎ উদ্ধার হয়না ..... তিনি সেই মহাশক্তি। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, মা-ঠাক্‌রুণ গেলে সর্বনাশ। এই মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। .... দাদা, মায়ের ওপর যার ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও।'' অন্তরালবর্তিনী মায়ের প্রতি স্বামীজীর এই অপরিসীম শ্রদ্ধা আমাদেরকেও মাতৃপাদপদ্মে প্রণত হইতে শিখায়। স্বামীজীকে আরো বলিতে শুনা যাইত —''মা, ঠাকুরের চাইতেও বড়।'' অনেক সময় মনে সংশয়ের উদ্রেক হইলে স্বামীজী মায়ের নিকট সমাধান খুঁজিতে আসিতেন। পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী বলিতেন —''মাকে চেনা বড় শক্ত .....সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর চিনিয়ে না দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতুম?''

ঠাকুর স্বয়ং গোলাপমাকে বলিয়াছিলেন —''ও

সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই রূপ ঢেকে এসেছে।'' অন্য একদিন ঠাকুরই শিবানন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন — ''এই যে মন্দিরের মা আর নহবতের মা — অভিন্ন।'' বাংলা ১২৭৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালিকাপূজার দিন ঠাকুর জগন্মাতার পুজোর আয়োজন সারিয়া পূজার সময় তথায় শ্রীশ্রীমাকে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দেন। মা আসিলে তাঁহাকে আলিম্পন ভূষিত পীঠে বসাইয়া ঠাকুর দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগ নিবেদন করিলেন। সমাধিস্থ পূজক ও সমাধিস্থা দেবী আত্মস্বরূপে একীভূত হইলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষপাদে আপন বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর জপমালা সহ আপন সাধনার ফল দেবী পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন —''সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।''

পরবর্তীকালে ঐ দিন পূজা প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন — ''তিনি আমার পায়ে আলতা পরিয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন, সিঁদূর দিলেন, পান - মিষ্টি খাওয়ালেন। কিন্তু আমি কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিলাম। সবই দেখেছি, অথচ কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না।'' পূজা সমাপনান্তে মা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আপন কক্ষে চলিয়া যান। এই ষোড়শী পূজার সময় মায়ের উনিশ বৎসর আর ঠাকুরের সাঁইত্রিশ বৎসর চলিতেছিল। এই পূজা দ্বারা ঠাকুর জন-মানসে মাতৃসত্তার স্বরূপের জ্ঞানটি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ ঠাকুর জানিতেন অদূর ভবিষ্যতে মা-ই হইবেন সঙ্ঘ জননী এবং বহু ভক্তের জীবন কাণ্ডারী। ঠাকুর প্রায়শঃই মাকে কহিতেন —''আমি আর কি করেছি? তোমাকেই সব করতে হবে।'' আহা! স্বয়ং শিবই আপন শক্তিসত্তার হস্তে সর্বস্ব তুলিয়া দিলেন।

দরিদ্র পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ ও জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ার সুবাদে মাকে বহু সাংসারিক দায়িত্ব বহন ও কর্মপালন করিতে হইত। মায়ের একজন আশ্চর্য সহচরী ছিল। যাহার প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে মা কহিতেন—''ছেলেবেলায় দেখতুম, আমারই মতো আরেকটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সকল কাজে আমায় সাহায্য করত। আমার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদও করত, কিন্তু অন্য কেউ এলে আর তাকে দেখতে পেতুম না।'' শিশুকালে পিতৃগৃহে পড়াশুনার সুযোগ কম পাইলেও তাঁহার মানসিক বিকাশ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অতি উত্তমরূপেই গঠিত হইয়াছিল। সাংসারিক দারিদ্র্যতা হেতু শুধুমাত্র সাংসারিক কর্মেই পটু ছিলেন এমন নহে। পূজা-পার্বণ, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি তাঁহাকে ধর্ম, নীতিবোধ ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানলাভে সহায়তা করিয়াছিল। পিতামাতার নিষ্কলুষ চরিত্র ও নিঃস্বার্থ জীবনচর্চা মাকে মুগ্ধ করিত। পরবর্তীকালে উদ্বোধনের বাড়ীতে সেবক স্বামী অরূপানন্দকে মা বলিয়াছিলেন — ''আমার বাবা ছিলেন পরম রামভক্ত ও পরোপকারী, মায়ের অন্যের প্রতি কত দয়া, তাই তো আমি এই ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম।''

মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে ঠাকুরের সহিত তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর ঠাকুর চলিয়া যান দক্ষিণেশ্বর, মা ফিরিয়া যান পিত্রালয়ে। মায়ের যখন তেরো-চৌদ্দ বৎসর তখন ঠাকুরের কামারপুকুরে আসা উপলক্ষ্যে মা-ও শ্বশুরগৃহে আসেন। সেই সময় অন্য মেয়েদের সহিত মাকেও ঠাকুর ধর্ম কথা শুনাইতেন। কথা শুনিতে শুনিতে মা ঘুমাইয়া পড়িলে অন্য মেয়েদের ঠাকুর বলিতেন —''ওকে তুলো নি, ও এখন যদি সব শোনে থাকবে নি, চোঁ চা দৌড় মারবে।'' ভবিষ্যৎ জগৎ কল্যাণ কার্যে মাকে নিয়োজিত করিতে ঠাকুরের কি অপূর্ব প্রয়াস!

ইংরাজী ১৮৭২ সন হইতে মা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। ঠাকুরের জীবদ্দশায় মা অন্ততঃ আটবার আসেন। প্রায় দশ বৎসর কাল ঠাকুর সান্নিধ্যে দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়াছিলেন। এই সময়টিকেই মা তাঁহার জীবনের সর্বোত্তম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর প্রসঙ্গ উঠিলে পরবর্তীকালে আনন্দে আত্মহারা হইয়া কহিতেন, ''তখন কি আনন্দেই না ছিলাম!'' দক্ষিণেশ্বরে মা মূলতঃ নহবতের নীচেই থাকিতেন। আনুমানিক ৬ হাত x ৪ হাত একটি কামরা, এক কথায় মানুষের বাসের অযোগ্য। কলিকাতা হইতে মহিলা ভক্তগণ মায়ের ঘরে আসিয়া কহিতেন — ''আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতালক্ষ্মী আছেন — যেন বনবাস গো! কি সহ্য শক্তি!'' নীরবে আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন ভবিষ্যৎ কর্মযজ্ঞের নিমিত্তে। মায়ের প্রতি ঠাকুরের উপদেশের অন্ত ছিল না। ঠাকুর প্রদত্ত শিক্ষা কোন সাধারণ মামুলী শিক্ষা ছিল না। মায়ের ভাষায় —''প্রদীপে সলতে কি ভাবে রাখতে হবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, পরের বাড়ীতে গেলে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ সংসারের কথা থেকে - ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সকল বিষয়েই তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।'' ঠাকুরের ধ্যান, ধারণা ও জীবনচর্চা মাকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল। ঠাকুর প্রদত্ত শিক্ষাই মায়ের জীবনে পরবর্তী সময়ে

প্রতিফলিত হইয়াছিল। ঠাকুরই মায়ের গুরু, শিক্ষক, আচার্য ও পথ প্রদর্শক।

সাংসারিক শত কর্মের মধ্যেও মা আপন সাধনাকে বিঘ্নিত হইতে দেন নাই। ঠাকুর একদিন সারদা মহারাজকে নহবতে পাঠান মায়ের নিকট হইতে দীক্ষা লইতে। দেখা যাইতেছে ঠাকুর মায়ের জীবনের নির্দিষ্ট ভগবৎ বিষয়ক কর্ম অর্থাৎ জীবোদ্ধার কর্মের গোড়াপত্তন নিজের জীবিতকালেই করিয়া গিয়াছেন। মায়ের দীক্ষাদান ইঙ্গিত দেয় যে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেই ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে মায়ের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাহা না হইলে ঠাকুর কখনোই মাকে দীক্ষার গুরু দায়িত্ব লইতে নির্দেশ দিতেন না।

ইংরাজী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অসুস্থ হইয়া ঠাকুর কলিকাতার শ্যামপুকুরে আনীত হন। দুই-তিন সপ্তাহ পর মা-ও কলিকাতায় আসেন। ওই বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরের উদ্যান বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া যাওয়া হয়। ১৮৮৬ সনে ১৬ই আগষ্ট এই মহাপ্রাণ মহা সামধিমগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর মায়ের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বলরামবাবু শোকসন্তপ্তা মাকে মানসিক শান্তি লাভের নিমিত্ত বৃন্দাবন তীর্থে প্রেরণ করেন। মায়ের সঙ্গে যান যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ, লক্ষ্মী দিদি, গোলাপ মা ও নিকুঞ্জ দেবী। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মা আরো তেত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়েই মা আপন নির্দিষ্ট কর্মে ব্রতী ছিলেন- করিয়াছেন অগণিত মানুষকে অহেতুকী কৃপা, বিলাইয়াছেন অকাতরে করুণা। ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। এই সময় বলরামবাবু, পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রামবাবু মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুভার স্ব-ইচ্ছায় বহন করিতে লাগিলেন। এঁরা ব্যতীত মাষ্টার মশাই, গিরিশবাবু প্রভৃতি সময়ে সময়ে মাকে অর্থ পাঠাইতেন। যোগীন মহারাজই মায়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তখন মা প্রধাণতঃ জয়রামবাটী, কামারপুকুর নতুবা কলিকাতায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাড়াটিয়া বাটী বা ভক্তগৃহে কালযাপন করিয়াছেন।

স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ইংরাজী ১৮৯৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গঙ্গাতীরস্থ বেলুড়ে আঠারো বিঘা জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে মঠ নির্মাণ করেন। ওই বৎসরই নব নির্মিত মঠে ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মঠের নিমিত্ত জমি ক্রয় প্রসঙ্গে মা পরে বলিয়াছিলেন —"মঠের নতুন জমি কেনা হলে নরেন একদিন আমাকে নিয়ে জমির চতুঃসীমা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বললে -'মা তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও'।" মাঝে মধ্যে মা আসিয়া বেলুড় মঠে থাকিয়াছিলেন। ১৯০৯ সনে শরৎ মহারাজের উদ্যোগে, কেদার দাস কর্তৃক দান করা জমিতে উদ্বোধনের গৃহ প্রস্তুত হয়। নিম্নে উদ্বোধনের কার্যালয় উপরে মা থাকিতেন। মায়ের বাস করা কালীন এই গৃহ ভক্তগণের নিকট মহাতীর্থে পরিণত হয়। জীবনের শেষদিকে মা মূলতঃ উদ্বোধন গৃহ নতুবা জয়রামবাটীতেই থাকিতেন। মাত্র দুইবার অন্যত্র যান। একবার কোঠার হইয়া রামেশ্বর অন্যবার কাশীধাম।

ঠাকুরের উপদেশাবলী জগৎবাসীর নিকট এক অমূল্য সম্পদ। ঠাকুর তাঁর সুগভীর সাধনায় যে অমৃত অর্জন করেন, বিবেকানন্দ যে বার্তা জগতে প্রচার করিয়াছেন, কৃপাময়ী জননী সারদা নীরবে তাহাই বিতরণ করিয়াছেন অবারিত হস্তে মুক্তধারায়। মা ছিলেন দেবালয়ের বিগ্রহ স্বরূপ। স্নেহঘন কল্যাণময় রূপ — দর্শনেই শান্তি! মা একান্ত প্রয়োজন বিনা উপদেশ দিতেন না। বিগ্রহ দর্শনমাত্রেই যেখানে জীবের শান্তি সেখানে উপদেশের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তথাপি সন্তানের হিতার্থে অথবা প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্তে মাকে কথা কহিতে হইত। মায়ের ঐ সব উপদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে — সীমিত শব্দের প্রয়োগ, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। সন্তানগণকে সাহস ও বল জোগাইয়া তাহাদের জীবন মার্গকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। এত অল্প পড়াশুনা করিয়া কোথা হইতে পাইয়াছিলেন এই অপূর্ব প্রকাশ ভঙ্গিমা!

যে ব্যক্তিই মায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অসীম স্নেহে তাকেই মা প্রদান করিয়াছেন — শান্তি, মুক্তি, অভয় মন্ত্র। মায়ের নিকট সকল ধর্ম, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় একই সূত্রে গ্রথিত। তিনি মানিতেন - সবই এক, শুধু রূপের প্রভেদ। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ সর্বদা মাকে পূজা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

১৯১৯ সনে জয়রামবাটীতে মা অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২০, উদ্বোধন গৃহে আনীত হন। দীর্ঘ পাঁচমাস ব্যাপী চলিল বহু প্রকার চিকিৎসা। রোগ যন্ত্রনায় খুবই কষ্টভোগ করিয়াছেন, কিন্তু কেন এত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন? হয়তো বা সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া অকাতরে পাত্রে অপাত্রে কৃপা বিতরণের ফলেই জুটিয়াছিল এই অলঙ্ঘ্য প্রাপ্য! নতুবা স্বর্ণ-বিগ্রহে কালিমা কোথায়? ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিল সেই

ভয়ঙ্কর দিন। ১৯২০ সন ২০শে জুলাই, রাত্রি একটা হইতে মাকে নাম শুনানো আরম্ভ হয়। রাত্রি দেড়টা নাগাদ গভীর সমাধিতে স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে ফিরিয়া যান।

মায়ের স্থূলদেহ বিলীন হইল সত্য। কিন্তু তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের আলোক বন্যা আজিও অশান্ত পথিককে আলোকময় পথের সন্ধান দিতেছে। তাঁহাকে ভুলিবার সাধ্য জগতের নাই। মা ও ঠাকুরের যুগলমূর্তি বহুবার ধরার বক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে। পুনরায় হইবে। এমত আশ্বাসবাণী মা স্বয়ং সেবক আশু মিত্রকে শুনাইয়াছিলেন — ''যারা একবার এসেছে, তাদের সকলকে আসতে হবে কেউ বাদ যাবে না। আকাশে চাঁদ দেখেছ? চাঁদ কি একলা ওঠে? চারিদিকে তারাগুলোকে নিয়ে, তবে ওঠে।''

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিয়ে যাওয়া আশ্বাসেরই পুনরাবৃত্তি —''সম্ভবামি যুগে যুগে।''

(সহায়ক গ্রন্থ : শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী)

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী সুস্মিতা বসু

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

ষষ্ঠবিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *তন্মাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।*
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ।।৩৯

শব্দার্থ :— তৎ ন অত্র বিস্ময় — এখানে অবাক হবার কিছু নাই। সম্মোহ্যতে - মোহিত করে।

বাংলা শ্লোকার্থ :— মহামায়া জগদীশ্বর হরিকেও যোগনিদ্রামগ্ন রাখেন। এই জীব জগৎও যে তাঁর (মহামায়া) প্রভাবে মোহিত থাকবে, তাতে অবাক হবার কিছু নাই।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— সুরথ ও সমাধির বিশেষ অবগতির জন্য মেধা ঋষি বলছেন যে, স্ত্রী পুত্রাদি ও অমাত্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েও তারা যে তাদের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা ত্যাগ করতে পারছে না বলে দিশাহারা, তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। কারণ স্বয়ং মহামায়া জীব শ্রেণীকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তিনি জগৎপতি হরিকেও যোগনিদ্রায় মগ্ন রাখেন। সুতরাং তিনি যে সাধারণ মানুষদেরও পার্থিব জীবনের বিভিন্ন স্বার্থপূর্ণ বিষয়ে মুগ্ধ করে রাখবেন, এতে বিস্মিত হবার কিছু নাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সন্তানদের প্রার্থনা পূরণ করে তাদের কল্যাণ সাধনই যখন বিশ্বমায়ের লক্ষ্য, তখন তাদের মোহিত রেখে কি উদ্দেশ্য তিনি পূরণ করতে চাইছেন? প্রকৃতপক্ষে 'মা' কখনো সন্তানের অনিষ্ট কামনা করেন না। সন্তানগণ এতদিন মায়ের নিকট পার্থিব বিষয় সম্পদ প্রার্থনা করে এসেছে এবং তাই দান করে মা তাদের আত্মবিস্মৃত করে রেখেছেন। বিষয় ভোগের পর মোহভঙ্গ হলে সন্তান যখন আন্তরিকভাবে প্রকৃতই 'মা'কে চাইবে, তখন জগজ্জননী সেই প্রার্থনাও পূরণ করে নিজ অঙ্কে স্থান দেবেন তাকে। সুতরাং মায়ের শরণাগত হয়ে সন্তানবৎ জীবের কোন অবস্থাতেই হতাশ না হয়ে মহামোক্ষ প্রদায়িনীর স্মরণ-মনন ও শরণাগত হয়ে চলাই উচিত।

শ্লোক :— *জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।*
বলদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।।৪০

শব্দার্থ :— জ্ঞানিনামপি - জ্ঞানীগণেরও; চেতাংসি - চিত্ত, মন; বলদাকৃষ্য - বলপূর্বক; মোহায় প্রযচ্ছতি - মোহগ্রস্ত করে।

বাংলা শ্লোকার্থ :— সেই দেবী ভগবতী জ্ঞানীদের চিত্তকেও সবলে আকর্ষণ করে বিষয় মুগ্ধ করেন।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— যৌগিক চেতনায় দেবী ভগবতী মহামায়ার অর্থ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। 'দিব্' ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা। ভক্তদের নিয়ে বিভিন্ন পটভূমিকায় লীলা করা যাঁর প্রকৃতি তিনিই 'দেবী'। তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী এবং মহাশক্তি রূপিণী মহামায়া। এই দেবী ভগবতী মহামায়ার লীলার বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি শুধু সাধারণ মানুষদের নয়, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন যোগীদের এমন কি উচ্চকোটী মহাত্মাদেরও চিত্তকে কখনও কখনও তাঁর মায়ার আবরণরূপী মহাশক্তি প্রয়োগ করে আত্মস্থ অবস্থা ও বিবেক জ্ঞান থেকে বিচ্যুত করেন এবং পার্থিব স্থূল বিষয়ে আকৃষ্ট করতঃ নিমগ্ন করে রাখেন। কেউ-ই মহামায়ার প্রভাব থেকে অব্যাহতি পায় না। উচ্চকোটীর যোগী এই অবস্থায় বিচলিত বা হতোদ্যম না হয়ে সকল ঘটনাই 'মহামায়ার কৃপা' বলে উপলব্ধি করেন। মাতৃ-আশীর্বাদে তিনি যেমন সাধনার উচ্চস্থান লাভ করেছেন, তেমনি মাতৃ-ইচ্ছাতেই প্রারব্ধ ক্ষয় নিমিত্ত ইন্দ্রিয় জনিত জ্বালা যন্ত্রণাকে ভোগ বলে মনে করেন। সমভাবে আপাত বিরোধী উভয় অবস্থাকে বরণ করে নেওয়া প্রকৃত সাধকের কর্তব্য। *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তেজ উচাতে।
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ।।২৫।।

গুকারশ্চ অন্ধকারঃ স্যাৎ ('গু' শব্দেন অন্ধকারঃ জ্ঞেয়ঃ) রুকারস্তেজ উচ্যতে ('রু' কারেণ তেজঃশক্তিরেব জ্ঞেয়া), তয়া তেজঃশক্ত্যা ব্রহ্ম অজ্ঞানধ্বংসকং (তিমিরনাশকং), তদ্‌ব্রহ্ম গুরুরেব (অত্র) সংশয়ঃ ন ।।২৫।।

'গু' শব্দে অন্ধকার এবং 'রু' শব্দে আলোক, অতএব

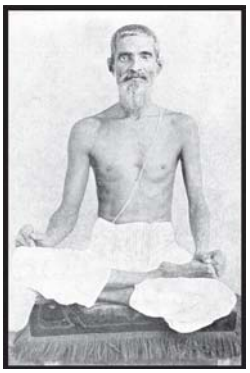

শ্রীহরিমোহন বাবা

অন্ধকার হইতে যিনি আলোকে লইয়া যান, তিনিই গুরু। নিম্নস্তরে স্থিত জগৎই অন্ধকারের স্থান, তথা হইতে ঊর্দ্ধে গতি হইয়া ব্রহ্মদর্শন হয়, সেই ব্রহ্মই গুরু; তিনি সূর্য্যরূপে জীব সম্মুখে প্রকাশ হইয়া জীবের অন্ধকার রূপ অন্ধকার দূরীভূত করেন। জীব ভাবিতেছিল জগৎ সত্য ও নিত্য ইহাই অজ্ঞান, এক্ষণে ব্রহ্মপ্রকাশে জীব বুঝিল যে জগৎ মিথ্যা ও অলীক; সে কারণ জীবের অজ্ঞানের ধ্বংসকস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই হইতেছেন।।২৫

গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদি-গুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়াভ্রান্তিবিমোচকঃ।।২৬।।

গুকারঃ যঃ প্রথমো বর্ণঃ স মায়াদি গুণভাসকঃ, রুকারঃ যঃ দ্বিতীয়ো বর্ণঃ স এব ব্রহ্ম, সঃ মায়য়া যা ভ্রান্তিঃ উৎপদ্যতে তস্যাঃ বিমোচকঃ (নিবারকঃ)।।২৬

'গু' এবং 'রু' এই দুই বর্ণের দ্বারা গুরু শব্দের উৎপত্তি, প্রথম বর্ণ 'গু'কারের দ্বারা মায়াজনিত ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিকাশ হয়, এবং দ্বিতীয় বর্ণ 'রু'কারের দ্বারা ঐ মায়িক ভ্রমাত্মক জ্ঞানের লোপ হয়।।২৬।।

গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে।।২৭।।

গুশব্দশ্চ অন্ধকারঃ স্যাৎ, রুশব্দঃ তৎনিরোধকঃ, অন্ধকারস্য (তমসঃ) নিরোধিত্বাৎ (নিরোধ-হেতুনা) গুরু ইতি অভিধীয়তে (সঃ গুরু নাম্না কথ্যতে)।।২৭।।

'গু' শব্দে অন্ধকার এবং 'রু' শব্দে তন্নিরোধক আলোককে বুঝায়, অন্ধকার নিবারক বলিয়া তিনি গুরু বলিয়া কথিত হন।।২৭।।

এবং গুরুপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
হাহা-হুহুগণৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বাদ্যৈশ্চ পূজ্যতে
এবং তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।।২৮।।

এবং শ্রেষ্ঠং গুরুপদং দেবানামপি দুর্ল্লভং, গন্ধর্ব্বাদ্যৈশ্চ এব তৎ পূজ্যতে, এবং তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং তত্ত্বং গুরোঃ (তত্ত্বাৎ) পরং ন অস্তি।।২৮।।

এইরূপ গুরুপদ দেবগণেরও দুর্ল্লভ, হাহা হুহু গন্ধর্ব্বাদিগণও তাঁহাকে পূজা করেন, এইরূপ দেব ও গন্ধর্ব্বগণের তত্ত্ব গুরুর তত্ত্বের পরপারে নহে।।২৮

দিব্ অর্থে আকাশ, অর্থাৎ আকাশ বা স্বর্গলোকে যাঁহার অবস্থিতি আছে তিনি দেব। দিব্ অর্থে দীপ্তি, সুতরাং আকাশ-স্থিত কূটস্থ-ব্রহ্মরূপী সেই দীপ্তিমান্ পুরুষের নাম দেব (গীতা ১১শ, অঃ, ৩৮ শ্লোক দেখ)। সেই দীপ্তিমান্ পুরুষের দীপ্তি অবলম্বনে যাঁহারা আছেন তঁহারা দেবতা। দেবতা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক, কারণ দেবতাগণের সম্যক্‌রূপে জড় সংস্কার ঘুচে নাই বলিয়া তাঁহাদের দেবতা বলা হয়, তদ্রূপ সংস্কার ঘুচিলেই তাঁহারা দেবে পরিণত হইবেন - স্ত্রীর পুরুষ-অঙ্গে লয় হইয়া তাহার উদ্ধার হইবে। (দেবং দ্যুতিং ক্রীড়াং বা তনোতি যা সা দেবতা ইত্যমরঃ)। যিনি দেব সঙ্গে দেবতাভাবাপন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাকেও দেব বলা হয়, দেবভাব ও মানুষভাব (প্রকৃতিভাব) একত্রে জড়িত থাকিলেই তাঁহাকে দেবতা বলা হয়। প্রকৃতিভাব দেবঅঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইলে প্রকৃতি অঙ্গ আর স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না, তখন দেবতাই দেব হইয়া যান। দেবের আদি বলিয়া অক্ষর ব্রহ্মকে আদি দেব বলা হয় (গীতা ১১শ অঃ, ৩৮ শ্লোকে দেখ)।

গন্ধর্ব্ব — স্বর্গগায়ক বা দিব্যগায়ক অর্থাৎ যিনি নাদ শ্রবণে আছেন। যথা — 'তুম্বুরুনারদশ্চোভৌ দেবানামপি দুর্ল্লভৌ। নাদরূপী শিবঃ সাক্ষাৎ নাদতত্ত্ববিদৌ হি তৌ' — ইতি কাশী খণ্ডঃ। সুতরাং গন্ধর্ব্ব অর্থে যাঁহারা নাদশ্রুতি অবলম্বনে আছেন। *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

ঊনবিংশপর্য্যায় —(দ্যাবাপৃথিবী)

বৈদিক সাহিত্যে কিছু যুগ্ম দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের মধ্যে দ্যাবাপৃথিবী অন্যতমা, বিভিন্ন কারণেই দ্যাবাপৃথিবীর উপরে আমাদের নজর দিতে হবে কারণ তন্ত্রের যে যুগনদ্ধ উপাসনা বা ভৈরবসংযুক্ত ভৈরবীর উপাসনা তার সঙ্গে দ্যাবাপৃথিবী তত্ত্বের কিছু মিল আছে। দ্যাবাপৃথিবী শব্দের মধ্যে দুজন দেবতাকে মেলান হয়েছে, একজন হলেন দৌস্ এবং অপরজন পৃথিবী। দ্যৌস্ বা আকাশের দেবতা কখনো এককভাবে আবার কখনো বা পৃথিবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে স্তুত হয়েছেন। একটি সম্পূর্ণ সূক্ত বা কবিতায় ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে আমরা দ্যৌ এর স্তুতি পাই না। ঋগ্বেদের একটি সূক্তেই কেবল (ঋক্ সং ৫/৮৪) পূর্ণরূপে পৃথিবী দেবতার স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। যখন দ্যৌ ও পৃথিবী একসঙ্গে স্তুত হন তখন তাদের যুগ্মরূপকে দ্যাবাপৃথিবী বলা হয়েছে। দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশ্যে সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতায় ছয়টি সম্পুর্ণ সূক্তের সন্ধান পাওয়া যায় (৭/৯৯/৩, ৮/৮৯/৫ ইত্যাদি)। তা ছাড়াও ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তের দুই একটি মন্ত্রে এদের উল্লেখ দেখা যায়। এই যুগ্ম দেবতাকে দ্যাবাপৃথিবী ছাড়াও দ্যাবাক্ষমা, দ্যাবাভূমী, রোদসী ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়েছে। যেখানে যুগ্মভাবে দ্যাবাপৃথিবীর স্তুতি আছে সেই ক্ষেত্রগুলিতে দেখা যায় দ্যৌ অপ্রধান হয়ে গেছেন এবং পৃথিবীই প্রাধান্য পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে শাক্তদের তন্ত্রধারায় দেবীরই প্রাধান্য, ভৈরব অপ্রধান।

ঋগ্বেদের মন্ত্রে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বের জনক-জননী হিসাবে স্তুত হয়েছেন। পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন যে ঋগ্বেদে প্রথমে দেবতারূপে পৃথিবী স্বীকৃতি লাভ করেন নি, পরবর্তীকালে তিনি একাকী এবং দ্যৌ এর সঙ্গে যুগ্মভাবে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। অথর্ববেদে পৃথিবী একটি বিশেষ তাৎপর্য্যে মণ্ডিতা দেবতা। আমরা আলাদা ভাবে পৃথিবীকে নিয়ে আলোচনা করব। দ্যৌ এর সঙ্গে স্তুতা হলেও পৃথিবী কোথাও তার মাতৃত্বের ও দেবীত্বের মহিমা হারিয়ে ফেলেন নি। বৈদিক ঋষিরা প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী মাতা হিসাবেই পৃথিবীর স্তব করে তাঁদের শ্রদ্ধাহূতি নিবেদন করেছেন। তাঁরা বলেছেন - বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মা, 'মাতা পৃথিবী মহীয়ং'।

সৃষ্টির বাহ্যিক দিকটা পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বৈদিক ঋষিরা স্বাভাবিক ভাবে দেখলেন - পুরুষ নারীতে রেতসেকের ফলে প্রজাদের উৎপত্তি হয়। তেমনি ভাবে আকাশের বৃষ্টির ধারা পৃথিবীর বুকে পড়ে নব প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। দ্যৌ-রূপ পিতার বর্ষাই হল রেতঃ, বর্ষা সিঞ্চনেই সকল প্রকার শষ্যের উৎপত্তি ঘটে। বহুপ্রাচীন মানবজাতির আদি বিশ্বাসের মধ্যেই আমরা প্রকৃতির এভাবে গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটি পেয়ে থাকি।

বেদের এই প্রাচীন পিতা-মাতার রূপ কল্পনার মধ্যে সার্বজনীন পিতামাতার সন্ধান পেলাম। এই ব্যাপারটিই আদি শিব-শক্তির কল্পনায় প্রসারিত হয়েছে। সৃষ্টিকার্য্যে দ্যৌ আর পৃথিবী অবিচ্ছিন্না। তেমনি পার্বতী ও পরমেশ্বরের অবিচ্ছিন্ন মূর্তির কথা তন্ত্রের ধারা বেয়ে কালিদাসেও প্রসারিত। রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রথমেই জগতের পিতামাতার অবিচ্ছেদ্য রূপের কথা বলতে গিয়ে মহাকবি কালিদাস লিখেছেন —

'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।।'

একই ভাবে সার্বজনীন পিতা মাতার কথা বলতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর অন্নপূর্ণা স্তোত্রের শেষে বললেন —

'মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্।।'

বেদের দ্যাবাপৃথিবী উপাসনা থেকে তন্ত্রধারার বিস্তার একথা মনে করার একটা কারণ হল ঋক্প্রাতিশাখ্যে ও বর্গদ্বয়বৃত্তিতে সন্ধির উপাসনার কথা বলতে গিয়ে শাস্ত্রকার বললেন, — আকাশ পূর্বরূপ পৃথিবী উত্তররূপ এবং দিগন্ত হল সন্ধি, একই ভাবে পিতা ও মাতা যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তররূপ এবং সন্তান সন্ধি। তন্ত্রধারার মিথুন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় হয়তো আরো অনেক উপাদান মিশেছে কিন্তু দ্যাবাপৃথিবীর উপাসনাকে সেক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না। উপনিষদে (বৃহদারণ্যকে) সৃষ্টির আদি এককে রমণের ইচ্ছায় স্ত্রী ও পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত দেখতে পাই। কারণ দ্বিতীয় না থাকলে রমণ হবে কিভাবে? সেই একের আত্মরতির জন্যই এক তত্ত্বের দ্বিধাকরণের প্রয়োজন হয়েছিল। একই ভাবে ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্ প্রাণের মিথুন, অগ্নি সোমের মিথুন প্রভৃতি তত্ত্বের কথাও এসে পড়ে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা

বৈদিক দেবতা দ্যাবাপৃথিবীর উপরেই নজর দেব মিথুন তত্ত্বের আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে।

আগেই আমরা বলেছি যে ঋগ্বেদে একটি মাত্র তিনটি মন্ত্রের পৃথিবী সূক্ত আছে যার ঋষি হলেন অত্রির পুত্র ভৌম। মন্ত্রটিতে পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতা ও মেঘকে আকাশে উৎক্ষিপণ ক্ষমতার কথা আছে। সায়ণাচার্য্য পৃথিবী শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ ধরে একরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে। পৃথিবী প্রথিতা বা বিস্তৃতা বলেই তার এরূপ নামকরণ হয়েছে। যাস্ক প্রথ্ ধাতু থেকে পৃথিবী শব্দকে ব্যাখ্যা করে একই কথা বলেছেন (নিরুক্ত ১/৩/৭)। কেউ কেউ আবার দ্যাবাপৃথিবী শব্দের দ্বারা উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণকে বুঝিয়েছেন, কেউ বা অশ্বিদ্বয়কে বুঝিয়েছেন। সাধারণভাবে দ্যৌ শব্দটি আকাশকে বোঝায়। যাস্ক এর অর্থ করেছেন দ্যোতমান বা প্রকাশমান দ্যোতন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় দুর্গাচার্য রাত্রি এবং ঊষা উভয়কেই দ্যো বলেছেন। রাত্রি নক্ষত্রের জ্যোতিতে প্রকাশমান হয় আর ঊষা নিজের জ্যোতিতেই প্রকাশমান হয়। অতএব দ্যৌ স্বয়ং প্রকাশ এবং সূর্য, অগ্নি প্রভৃতির অসমধর্মী।

দ্যাবাপৃথিবীর উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছেন পণ্ডিতেরা আমরা উপেন্দ্রনাথ দাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি —'বেদেও ধরিত্রী বা পৃথিবীকে মাতা বলা হয়েছে আর দ্যৌ কে পিতা'।

প্রাচীন চীনে পিতা দ্যৌ এবং মাতা ধরিত্রীর পূজা ছিল সার্বজনীন। গ্রীকদের মধ্যে গোড়ার ধরিত্রীমাতার নাম ছিল গইয়া (Gaia)। প্রাচীন গ্রীসের ডেলফিকে (Delphi) ধর্মকেন্দ্র বলে মানা হয়। সেখানে অধিষ্ঠিত দেবতাদের মধ্যে কালানুক্রমে সকলের আগে দেবী গইয়ার স্থান। পরবর্তী কালে গ্রীসে ধরিত্রীদেবীর নাম হয়, ডিমিটার (Demeter)। এই দেবীর কল্পনায় অধিকতর নরত্বারোপ করা হয়। সারা দেশ জুড়ে ছিল এঁর বহু মন্দির। রোমকরা এঁকে সোজাসুজি টেরা মেটার (Terra Mater) অর্থাৎ ধরিত্রীমাতাই বলতেন। তাতার জনগুলির মধ্যে ধরিত্রীমাতার পূজা সুদৃঢ় ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক দেবতা Uranus এবং Gaia এর সঙ্গে দ্যাবাপৃথিবীর তুলনা করেছেন অনেকে।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরম পুরুষ ধর্ম সংস্থাপন ও জীব উদ্ধারের জন্য যুগে যুগে ধরায় অবতীর্ণ হন । ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটিশ শাসকদের ছত্রছায়ায় খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতের জনগণের একটা বিরাট অংশকে খ্রীষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত করছিল হিন্দু ধর্মকে পৌত্তলিকতা আখ্যা দিয়ে। সনাতন ধর্মের এই ধর্মসঙ্কটের সময়েই এসেছিলেন পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে। আত্মোপলব্ধির চরম মুহূর্তে তিনি নিজেই নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জেনেছিলেন তাঁর আবির্ভাব রহস্য। তিনি দেখেছিলেন গোপালরূপী এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় শিশু নিত্যলোক থেকে নেমে আসতে আসতে ঋষিমণ্ডলের এক ধ্যানমগ্ন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরে বলছেন, ''আমি যাচ্ছি, তুমিও এসো।'' সেই গোপাল শিশুর দৃষ্টিপাতের ফলে যে ঋষি শিশুটির জন্ম হয়েছিল কলিকাতায় শিমলাপাড়া লেনে, তিনিই হয়েছিলেন পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য ও লীলা প্রকাশের উপযুক্ত সহচর স্বামী বিবেকানন্দ। আর পরম পুরুষ জন্ম নিলেন এক অজ্ঞাত, অখ্যাত কামারপুকুর গ্রামের এক অতীব সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় পূর্বেই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন গয়ায় গিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে যে, স্বয়ং গদাধর তাঁর পুত্ররূপে আসছেন। তাই গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে সেই শিশুটির যখন আবির্ভাব হল তখন তাঁর নাম রাখা হল 'গদাধর'। গদাই বলেই তাঁকে ডাকা হত।

বাল্যকাল হতেই তাঁর মধ্যে দেখা যেত অসাধারণ লক্ষণ সকল। পাঠশালায় গিয়ে তিনি সমস্তই শিখলেন কিন্তু অঙ্কে যোগ, বিয়োগ শিক্ষাকালে বিয়োগ করা কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকতো না। আর ঢুকবেই বা কেমন করে? যিনি সর্বদা যোগে যুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁকে বিয়োগ শেখাবে কে? কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যেমন সাহিত্য, ছবি আঁকা, অভিনয় দক্ষতায় তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। আর রামায়ণ মহাভারত বা যে কোন যাত্রার পালা কীর্ত্তন একবার শুনলেই তা মুখস্ত হয়ে যেত। পাড়া প্রতিবেশীরা ডেকে নিয়ে তাঁর মুখে সেই সব পালাকীর্ত্তনের কথা শুনতেন।

একবার এক যাত্রাপালায় যিনি শিবের অভিনয় করবেন, তাঁর হল পেটখারাপ। ভীষণ অসুস্থ। তখন গদাইকে নিয়ে

গিয়ে শিব সাজিয়ে শিবের অভিনয় করতে নামানো হল। কিন্তু তিনি অভিনয় করবেন কি? নিজেই শিবের আবেশে সমাধিস্থ। সেই ধ্যান ভাঙাতে তখন সকলের কত প্রচেষ্টা! কিন্তু যাত্রা দেখতে এসে লোকেরা আসল শিবকে দেখে হল মুগ্ধ ও বিস্মিত। এর পরেও দেখা গেছে যখন যে দেবতার মন্দিরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হত, সেই সেই দেবতার আবেশ তাঁর মধ্যে স্ফুরিত হত। একবার এক ঝাঁক বক, নীল আকাশে উড়ে যেতে দেখে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮/৯ বৎসর। সেটাই ছিল প্রথম সমাধি। ১৭/১৮ বৎসর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন তাঁর বড়দাদার হাত ধরে, যিনি মা ভবতারিণীর পূজার ভার নিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্যে রাণী রাসমণির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। অচিরেই তাঁর বড়দাদার অবর্ত্তমানে তিনিই শ্যামামায়ের পূজার ভার প্রাপ্ত হন। রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মা ভবতারিণীকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর ঈশ্বরীয় ভাব। আর রাণীর জামাতা শ্রীমথুরনাথ বিশ্বাসের সহায়তায় পরিপুষ্ট হতে থাকে তাঁর দিব্য লীলা।

এই সময়ে তিনি জীবন-মরণ পণ করে মাতৃসাধনায় ডুবে গিয়েছিলেন। গঙ্গার তীরে শুয়ে তিনি মুখ ঘষে ঘষে কাঁদতেন আর বলতেন, ''একটা দিন চলে গেল, দেখা দে মা, দেখা দে।'' এই ভাবে তাঁর মুখ, বুক ছড়ে গিয়ে রক্ত বের হত। তথাপি সেই করুণ ক্রন্দন! ''দেখা দে, দেখা দে মা! দেখা দিবি না তো? তবে তোর হাতের খড়্গ দিয়েই এই জীবন শেষ করব!'' খড়্গ নিয়ে উদ্যত হলেন তিনি আপনার জীবন নাশে। তখনই তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের দিব্যরূপ দর্শন লাভ করেন। এইভাবেই তিনি জাগ্রত করেছিলেন সেই পাষাণ প্রতিমা মা ভবতারিণীকে। তারপর হতে তো মা ও ছেলে একাকার। কার পূজা যে কে করতেন বোঝাই ছিল দায়। তাঁর এই দিব্য ভাবের অবস্থা অনেকেই বুঝতে পারেন নি। তারা ভাবতেন উনি উন্মাদ হয়ে গেছেন। তখন পরামর্শ করে আত্মীয়রা বিবাহের কথা ভাবছিলেন। তখন স্মিত হাস্যে নিজেই তিনি বিধান দিলেন কোন গৃহে আছে তাঁর যোগ্য সহধর্ম্মিণী। স্বনির্বাচিত পাত্রীর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ দেওয়া হল। পাঁচ বছরের কনে আর ২৪ বছরের বর। পরম যত্নে তিনি গ্রহণ করলেন তাঁর স্ত্রীকে। কিন্তু তাতেও তাঁর আচরণের কোন পরিবর্তন হয়নি। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে গেছেন আজীবন। শ্রীশ্রীমা সারদাকে শেখাতেন তিনি সংসারের কাজ আর ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ। পরবর্তীকালে সাধনা শিক্ষাও দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব 'শ্রীশ্রীঠাকুর' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা ছিল অতি সাধারণ লোকের মত, যেন আলা-ভোলা, কিছুই জানেন না। স্বামী বিবেকানন্দের ডাক নাম ছিল নরেন। তাঁকে তিনি 'লরেন' বলে ডাকতেন। ভাল করে যেন কথাও বলতে পারেন না। কিন্তু প্রেমে ও ভালবাসায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি নির্জনে গিয়ে কাঁদতেন আর বলতেন, ''মা, আমার ত্যাগী সন্তানদের কবে এনে দিবি? আমি যে বিষয়ী লোকদের মধ্যে আর থাকতে পারছি না। ত্যাগী সন্তানদের জন্য আমার প্রাণ যে গামছা নেঙড়ানোর মত হচ্ছে।'' তার পরেই এক এক করে ত্যাগী ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে আসতে থাকেন।

তারাও কি তাঁকে কম বাজিয়ে নিয়েছেন? একবার তিনি নরেনের সঙ্গে এক মাস কথা বলেননি। তবুও সে নিত্য আসত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে পায়ে হেঁটে। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন, ''আমি তো তোর সঙ্গে কথা বলি না, তবু তুই আসিস কেন?''

নরেন বললেন, ''তোমাকে ভাললাগে তাই আসি।'' এক মুখ হাসি নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি তাঁর প্রিয় নরেনকে। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রচারবিমুখ নিরভিমানী শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বসেই হিন্দুমতের সকল সাধনা এবং ইসলাম ধর্মের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যিশু খ্রীষ্টকেও তিনি দর্শন করেছিলেন, যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহেতেই মিলিয়ে গিয়েছিলেন। নিজে সাধনা করে তারপরই তিনি এই মহাবাক্য ব্যক্ত করেছেন —''যত মত তত পথ''। সব ধর্মই সত্য। সব ধর্মই এক একটি পথ সেই মহান লক্ষ্যে পৌঁছবার। তিনি সহজ, সরল সাদা-মাটা কথার মধ্য দিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ বেদ, উপনিষদ ও গীতার গভীর উপলব্ধি ও তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন সাধারণ লোকের বোধগম্য করে। তাই দেখা যায় তদানীন্তন সমাজের পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও গুণীজনেরা তাঁহাকে দর্শন করতে এসে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে তাঁর পদতলে নত হতেন।

নরলীলার অন্তিমে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন জগতের ভার নিয়ে দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগে ভুগে জীর্ণ শীর্ণ হয়েছিলেন, তখনও নরেনের মনে ক্ষীণ সন্দেহ ছিল যে ''এই অস্থিচর্মসার দেহখানা, একে আবার লোকে ভগবান বলে। তবে উনি নিজ মুখে যদি বলেন যে উনি ভগবান তবেই বিশ্বাস করব।'' সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন, ''এখনো অবিশ্বাস? যেই

রাম, সেই কৃষ্ণ, সে-ই এই দেহে রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।'' নরেন তখন চোখের জলে লুটিয়ে পড়েছিলেন তাঁর চরণ যুগলে।

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম সম্মেলন সভায় গিয়ে তাঁরই এই আদর্শের কথা প্রচার করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তার আসনটি জয় করে নিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভারতবর্ষের ধর্মের প্রতি বিশ্বের নজর পড়ল। ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের অনুসন্ধানে আজও পাশ্চাত্য জগৎ তৎপর। পাশ্চাত্যবাসী স্বামীজীর অনুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁর কাছে শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর গুরুর কথা। তখন স্বামীজী তাদের বলেছিলেন, ''আমার গুরুকে বুঝবার সাধ্য আমার নেই, শুধু একটা কথাই তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারি, তিনি ছিলেন L-O-V-E Personified তাই তিনি তাঁর গুরুর প্রণাম স্তোত্রে ''অবতার বরিষ্ঠ'' বলে প্রণাম জানিয়েছেন। আমরা আর তাঁর কথা কি বলতে পারি। তাঁর কথা বলতে যাওয়া আর সমুদ্রের জল মাপা প্রায় একই কথা।

আমরা শুধু এই মহান পুরুষকে অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে পারি তাঁরই অন্যতম শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের ভাষায়—

''*জননীং সারদাং দেবীম্ রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং*
পাদপদ্মে তয়ো নিত্যং প্রণমামি মুহুর্মুহু।।''

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট যে বালিকাটিকে তিনি বিবাহ করেছিলেন, তিনি কোন অংশে কম শক্তিশালী ছিলেন না। তা না হলে কি আর তাঁর ষোল বছর বয়সে তাঁকে ষোড়শী ভুবনেশ্বীরূপে পূজা করেন ঠাকুর ফলহারিণী কালীপুজোর রাত্রে গোপনে? পুজো করে তিনি তাঁর সমস্ত সাধনার ফল, এমন কি জপের মালাটি পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীশ্রীমাও ছিলেন সর্বভাবেই সেই পুজো পাবার যোগ্য অধিকারিণী বরং বেশী করুণাময়ী। তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কষ্টবরণ সীতা, সাবিত্রী ও রাধাকেও অতিক্রম করে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেছে বেছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর ধর্মসংস্থাপনের কাজের জন্য। আর করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আপামর সকল সন্তানের ভার বহন করেছেন, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পাপী-তাপী নির্বিশেষে।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমার পিতৃদেব সেই শ্রীশ্রীমায়ের নিকটই দীক্ষালাভ করে তাঁর কৃপাধন্য হয়েছিলেন, যার ফল আজও পেয়ে চলেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি কি নিদারুণ সমর্পণ তাঁর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি! আমার ৮ বছরের ভাইটি যখন বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, সেই নিদারুণ শোকের মধ্যে তিনি আমার মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, ''কেঁদো না তুমি, আমার ঠাকুর তাঁর বুকে তাকে নিয়েছেন।'' শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ফটো পিতার শিয়রের দিকে থাকত। আমার নাস্তিক মামারা আমার পিতাকে রাগাবার জন্য বলতেন, ''জামাইবাবুর কি রুচি, ঐ বুড়োর ছবিটা অত যত্ন করে রেখেছে, যার না আছে কোন রূপ, না আছে কোন আকর্ষণ!'' উত্তরে পিতৃদেব হেসে তাদের বলতেন, ''আমি তো জগতে এত সুন্দর আর একজনকেও দেখলাম না।'' আমার পিতার জন্যই আমরা যখন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন রোজই উদ্বোধন বা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী যেতাম আর সেখানে প্রাচীন সব সাধুদের স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভ করেছি। তাঁদের ছত্রচ্ছায়া আমার কৈশোর হতে লাভ করেছি। তাঁরা জোর করেই আমাকে সমস্ত সদ্গ্রন্থ পাঠ করাতেন এবং তাঁদেরই বদান্যতায় আমি কিশোরী বয়সে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মহারাজ পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দের নিকট দীক্ষালাভ করি।

নিজের জীবনেও আমি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা উপলব্ধি করেছি। সে সব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আমার আট বছরের ছেলেকে দেওঘর বিদ্যাপীঠে ভর্ত্তি করার সময় আমার মন যখন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, সেই সময় স্বপ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও নির্দেশ পাই। তার ফলেই রামকৃষ্ণমিশনের 'দেওঘর বিদ্যাপীঠ' থেকে আমার দুটি ছেলেই মানুষ হয়ে বের হয়।

যুগে যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা নানা ভাবে অবতীর্ণ হন, একথাটা প্রত্যক্ষ করেছি, 'শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস' লেখার সময়। যখন আমার সদ্গুরুরূপী শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে বইটি লিখতে বসে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ি যে ঠিক মত লিখতে পারব তো? শ্রীশ্রীমা তখন বলেন, ''বীণাদি, তোমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরই হলেন চণ্ডীঠাকুর। তিনিই স্বয়ং তোমায় আশীর্বাদ করবেন।'' সত্যই সেই সময় একদিন পরম করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তখন বইটি লিখে আমার পরম

তৃপ্তিলাভ হয় এবং যারা পড়েন তাদেরও ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস ও রামী বা রাসমণির আবির্ভাবও হয়েছিল এই রকমই এক যুগসন্ধিক্ষণে, যখন মুসলমান নবাবদের অত্যাচারে ভারতের সনাতন ধর্ম ও জাতীয় জীবনে নেমেছিল ঘোর দুর্দিন। সেই সময় তাঁরা এসে সত্যধর্ম প্রচার করে দেশ ও ধর্মকে বিজাতিকরণের হাত থেকে রক্ষা করেন সঙ্গীতের মাধ্যমে। তারই বাণী, ''সবার উপর মানুষ সত্য।''

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ

(১০)

শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রী থেকে —

''ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং বিপন্নানং সদা শরণ্যম্।
ভৃত্যার্থিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।''

—শরণাগতের পালক হে মহাপুরুষ! তুমি ইন্দ্রিয়গ্রামের তাড়না ও কুটুম্বাদির অধীনতা নাশক, সর্বাভীষ্ট পূরণকারী, তুমি আমাদের সর্বদাই ধ্যানযোগ্য; তীর্থমাত্রের আশ্রয়স্বরূপ বিপন্ন ভক্তদের দুঃখনাশকারী হে মহাত্মন্! ভব-সমুদ্রের তরণীস্বরূপ তোমার চরণ কমলকে আমরা বন্দনা করি।

সেই রাতে ৫নং রামতনু বসু লেনের বাসায় নীচতলার একটা ঘরে তক্তপোষে শুয়ে চিন্তা করছি — আর দুদিন পরে শ্রীগুরুকৃপায় আমার মহাসৌভাগ্য উদিত হবে। যোগীজনসাধ্য দেববাঞ্ছিত শ্রীহরির চরণকমল দর্শন করে মানবজন্ম সম্পূর্ণ ধন্য হবে। এই চিন্তা ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সুক্ষ্মতর হয়ে গভীর নিদ্রায় আমাকে অভিভূত করে ফেলল।

স্বপ্ন দেখলাম —

দর্জ্জিপাড়ায় শ্রীগুরু শ্রীভূপতিনাথের বসতবাটির দক্ষিণে যেখানে মসজিদটির পাশে রামানন্দ লেন ও ছিদাম মুদী লেন মিলিত হয়েছে, সেই চৌরাস্তার উপর আসন করে পূর্বাস্য হয়ে বসে মুদিত নেত্রে আমি ধ্যান করছি। এমন সময় শ্রী ভূপতিনাথ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর ডান পাটি আমার মাথার উপর স্থাপন করে দাঁড়ালেন।

তৎক্ষণাৎ আমার সর্বাঙ্গ বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের ন্যায় স্পন্দিত হতে লাগল। শরীরের মধ্যে আনন্দপ্রবাহ বয়ে চলল। সে আনন্দ আমাকে অভিভূত করে প্রতি রোমকূপ দিয়ে বয়ে উপচিয়ে পড়তে লাগল। প্রতি শিরা উপশিরা আনন্দে থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমি এ আনন্দ আর ধারণ করতে পারছি না। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আনন্দে নৃত্য করি বা আকাশে উড়তে থাকি। কোন প্রকার শরীর চালনা ব্যতীত এ আনন্দ ধারণ করা সম্ভব নয়। দুই বাহু তুলে পাখির ডানার মত নাচাতে লাগলাম। গুরুদেব তাঁর ডান পা আমার মাথায় চেপে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার কোনমতেই ওঠবার সামর্থ্য নেই। তাই যথাসম্ভব উড়ে যাবার ভঙ্গিমায় দুই বাহু তুলে নাচাচ্ছি।

এমন সময় শ্রীগুরু জলদ গম্ভীর নাদে আদেশ করলেন; ''যাদুমণি, চোখ খোলো দেখ, তোমার প্রার্থিত বস্তু তোমার সামনে। ভগবান দর্শন করে তুমি কৃতার্থ হও।''

আমি চোখ খুলবার চেষ্টা করলাম, চোখের পাতা সজোরে টানতে লাগলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কোনমতেই চোখ খুলতে পারলাম না। যখন এই প্রকারে চোখ খুলবার চেষ্টা করছি, তখন শরীরের ভেতর একটা প্রক্রিয়া চলতে লাগল। চোখ খোলবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ প্রবাহের বেগ কমতে লাগল ও অল্পক্ষণ চেষ্টার পর সে আনন্দ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে শরীর ক্রমশঃ উষ্ণ হতে লাগল। অতঃপর যতই চোখ খুলবার চেষ্টা করতে লাগলাম ততই শরীর উষ্ণ হতে উষ্ণতর হতে লাগল। পরিশেষে সর্বশরীর হতে আগুনের শিষ্ বের হতে লাগল। শরীরের প্রতি রোমকূপের ছিদ্রপথে এক একটি অগ্নিশিখা বের হয়ে আমার দেহ পুড়িয়ে খাক্ করে ফেলল। মনে হল শরীরের চামড়া স্থানে স্থানে ফেটে যাবার উপক্রম করছে। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লাম। তখন তারস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগলাম, ''ম'লাম, গেলাম, রক্ষা কর, বাঁচাও, তোমার পা শীগ্‌গির নাবাও, আমি দেখতে চাই না, প্রাণ যায়, জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেলাম, রক্ষা কর আমাকে বাঁচাও।''

শ্রীভূপতিনাথ

আমার আর্তনাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে গুরুদেব গভীর নিনাদে ঘোষণা করলেন, ''গুরু আমি স্বয়ং ভগবান্, চোখ খোল্, তাকিয়ে দ্যাখ, তোর প্রার্থিত বস্তু তোর সম্মুখে!

বল্ মাভৈঃ, বল্ মাভৈঃ!'' গুরুদেব একবার মাভৈঃ বলেন আমি তাঁর চেয়েও উচ্চৈঃস্বরে আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার করি ''মাভৈঃ, মাভৈঃ।'' শ্রীগুরু পুনরায় আদেশ করলেন, ''এইবারে চোখ খোল্, তাকিয়ে দ্যাখ্।''

আমি চোখ খোলবার জন্য আরও চেষ্টা করতেই আমার যন্ত্রণা তীব্রতর বোধ হল। দেহের চামড়া চড়চড় করে ফেটে গেল; সমস্ত দেহ ফেটে সহস্র চিড় হয়ে গেল। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম, বল্লাম, ''পারি না, কোন মতেই যে চোখ খুলতে পারি না, রক্ষা কর, বাঁচাও, প্রাণ গেল, প্রাণ গেল; আমি ভুল করেছি, আমি দেখতে চাই না, রক্ষা কর, তোমার পা নাবিয়ে নাও।''

গুরুদেব এবারেও আমার কাতর আর্তনাদে ভ্রূক্ষেপ না করে ধীর গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, ''বল্ মাভৈঃ, বল্ মাভৈঃ, বল্ মাভৈঃ।''

আমি সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সমুচ্চস্বরে বলতে লাগলাম, ''মাভৈঃ, মাভৈঃ, মাভৈঃ।'' শ্রীগুরু পুনরায় বললেন, ''এইবারে চোখ খুলে দ্যাখ্, তোর প্রার্থিত ভগবান তোর চোখের সম্মুখে।''

আমি পুনরায় চেষ্টা করতে লাগলাম। অমনিই আমার শরীর হতে খণ্ড খণ্ড মাংস ও পেশী চারিদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। সমস্ত শরীরে চামড়া বা মাংস কিছুই অবশিষ্ট রইল না, শুধু হাড়গোড় রয়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে আকাশ বাতাস কাঁপাতে লাগলাম। সে যন্ত্রণা প্রকাশের ভাষা নেই। ক্রমাগত আর্তনাদ করে বলতে লাগলাম — ''রক্ষা কর, বাঁচাও, প্রাণ গেল, আর সহ্য হয় না, দয়া করে তোমার পা আমার মাথা থেকে নামাও।''

এবারেও পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে জলদ্‌গম্ভীর রবে শ্রীগুরু বললেন, ''বল্ মাভৈঃ, বল্ মাভৈঃ, বল্ মাভৈঃ! তোর বিনাশ হতে পারে না। গুরু আমি স্বয়ং অভয় দিচ্ছি। একটিবার চোখ খোল্, চোখ খুলে তাকিয়ে দ্যাখ্!''

আমি এবারে যখন চোখ খুলতে চেষ্টা করলাম, তখন আমার হাড়গোড়গুলো সব মট্‌মট্ শব্দ করে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলো হয়ে গেল। মাথার উপরে শ্রীগুরুর ডান পা তেমন রয়েছে, মাথা নেমে এসে ভূমিতে সংলগ্ন হয়েছে। শুধুমাত্র চেতনা অবশিষ্ট! আর চিৎকার করবার শক্তিও আমার নেই। আমি একেবারে হতাশ হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে বল্লাম — ''তুমি কিছুতেই শুনলে না! আর না, এইবারে আমার শেষ —!'' আমার বাক্‌শক্তি লোপ পেল।

শ্রীশ্রীগুরুদেব যেন ক্ষুণ্ণমনে পা-খানি মাথার উপর হতে নামিয়ে নিলেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ঘুম ভেঙ্গেও আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। আমার ধারণা, আমি সেই চৌরাস্তার সন্ধির উপর পড়ে আছি। আমার দেহ নেই — চামড়া, মাংস, হাড়গোড় কিছুই নেই। কিছুক্ষণ পরে আমি হাত দিয়ে শয্যা পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম, এতো খোয়া সুরকীর রাস্তা নয়, এযে নরম। আমি কোথায়, আমি কী তবে এখনও জীবিত আছি? এক হাত দিয়ে অন্য হাত স্পর্শ করে দেখি, মাথার চুল সব ভিজে গেছে। প্রথমে মনে হল রক্তে ভেজা। হাত শুঁকে দেখলাম, রক্তের গন্ধ নেই। সর্বাঙ্গে ক্রমশঃ হাত বোলাতে বুঝলাম চামড়া, মাংস, হাড়গোড় সবই আছে। তখন সংবিৎ ফিরে পেলাম। বুঝলাম এ সবই স্বপ্ন। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে জানলা খুলতেই দেখি — রাস্তায় জল দেওয়া হয়েছে, দু চারটি লোকও রাস্তায় চলছে। ভোর হয়েছে। বিছানা আমার দেহের ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। আমার মনে হল আমি বসে বসেই স্বপ্ন দেখেছি। কোন সময় উঠে বসেছি জানি না। বহুক্ষণ জড়বৎ বসে চিন্তা করতে লাগলাম, আমার অক্ষমতায় ক্ষুব্ধ হলাম, ধৃষ্টতায় মনস্তাপ পেতে লাগলাম। তারপর স্থির করলাম — আর দুদিন পরে নয়, আজই শ্রীগুরুর কাছে গিয়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে ক্ষমা চাইব। ভবিষ্যতে আর কখনও হঠকারিতা প্রকাশ করব না। গুরুদেবের কৃপার উপর নির্ভর করে সুসময়ের প্রতীক্ষা করব।

....ক্রমশঃ

——শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য

শ্রদ্ধার্ঘ্য

পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দময়ী মাতা ইংরাজী ৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁর ইহলীলা সংবরণ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ এক মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি অখণ্ড মহাপীঠের বহু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানদের তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ দেন। তাঁর শিশু-সুলভ সরলতাপূর্ণ আচরণ সকলের অন্তরকে অতি সহজেই স্পর্শ করত। শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দময়ী মায়ের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীমাও একবার সোনারপুরে অবস্থিত তাঁর 'মাতৃশক্তি' আশ্রমে গিয়েছিলেন।

আশ্রম সংবাদ

৩রা জানুয়ারী — এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে একটি মনমুগ্ধকর নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন মোহিনীআট্যম নৃত্য গুরু শ্রীমতী মোম গাঙ্গুলী ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ।

১৩-১৪ই জানুয়ারী — শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের আসন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের সপ্তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই জানুয়ারী আমাদের হোটর আশ্রমের সকল ছাত্রীদের শ্রীশ্রীমা প্রদত্ত উপহার প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী শ্রদ্ধা দাসগুপ্তের নৃত্য প্রদর্শনের পর হোটরের শিশু ও বালিকারা নিবেদন করে একটি মনোরম নৃত্যগীতানুষ্ঠান। ১৪ই জানুয়ারী শ্রীশ্রীমা পূর্ণ-সন্ন্যাস দান করেন ব্রহ্মচারিণী উমা (সাধ্বী প্রভানন্দময়ী) ও বাসন্তীকে (সাধ্বী ধীরানন্দময়ী)। তৎপরে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের পূজা ও যজ্ঞ। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যা ও ডঃ পার্থ প্রতিম চক্রবর্ত্তী রচিত 'মহাবতার বাবাজী মাহারাজ' নামক ইংরাজী পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। তৎপরে নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন শিশুশিল্পী অশোকা বোস ও পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীরা। আমাদের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সকল কর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়। এই দুইদিন বহু ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। শিবরামপুরে অবস্থিত শিশু বিদ্যালয়ের (ঐক্যতান) সকল শিশুগণও আমন্ত্রিত ছিল।

৮ই ফেব্রুয়ারী — এইদিন শ্রীশ্রীমা আশ্রমস্থ কয়েকজন সহ 'হোটর আশ্রম' পরিদর্শনে যান। সেখানে শ্রীশ্রীমাকে পূজা ও আরতির মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাধ্বী সুচেতানন্দময়ী ও সাধ্বী পুণ্যানন্দময়ী। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী ও শিষ্যাগণও এক-এক করে শ্রীশ্রীমাকে হার্দিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তৎপরে আশ্রমের বিদ্যার্থীরা একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী — শ্রীশ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবার ১০৫তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের অন্নভোগাদি প্রসাদ সহ স্বামী সদাশিবানন্দজী ও গুরুভগিনী শ্রীমতী শুভ্রা চ্যাটার্জীকে শ্রীশ্রীমা প্রেরণ করেন মনোহর পুকুরে অবস্থিত 'বঙ্গ উদাসী মঠে'।

১৭ই ফেব্রুয়ারী — শিবরাত্রির সন্ধ্যায় মন্দিরে শ্রীশ্রীমা কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীসহ অপূর্ব কিছু ভজন গান করেন। তারপর শ্রীশ্রীমা নিজ হস্তে একান্তে শিব পূজা করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞগৃহে শ্রীযজ্ঞনারায়ণদা শিবরাত্রির যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করেন।

৫ই মার্চ — দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আশ্রমে দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রুতিমধুর এক ভজনের অনুষ্ঠান ও পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের শিষ্যাবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত ওড়িষি নৃত্যের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দোল পূর্ণিমা তিথি পালিত হয়।

১৩-১৫ই মার্চ — শ্রীশ্রীমা কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও ভগিনী সহিত পুরী আশ্রম পরিদর্শনে যান। শ্রীশ্রীমা সেখানে অবস্থান কালীন প্রায় পঞ্চাশোর্দ্ধ দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়। বালিগোয়ালির 'ডিভাইন লাইফ সোসাইটি'র মোহন্ত শ্রীজিতমহানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও কিছু সময় সৎসঙ্গে অতিবাহিত করেন। ফেরবার পথে শ্রীশ্রীমা রেমুনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করতে যান।

২২শে মার্চ — আধ্যাত্মিক সভার পঞ্চদশ পর্বে 'উপনিষদ্ প্রসঙ্গে' দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডঃ পার্থ প্রতিম চক্রবর্ত্তী, (Director, IIT Kharagpur)।

২৭শে মার্চ — নবরাত্রির অষ্টমী তিথির সকালে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মায়ের পূজা হয় অন্নপূর্ণা মন্দিরে। পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর উপস্থিত সকল ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে পরিবেশিত হয় ভক্তিগীতির একটি অনুষ্ঠান।

২৮শে মার্চ —এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে রামনবমী উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর ভজনের অনুষ্ঠান হয়।

परम पुरूष के निरंतर गभीर स्पर्श में

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

यह उस समय की बात है जब कालीघाट के निकटस्थ चेतला में रथ का मेला लगता था। उस रथ-मेले से मेरी माताजी ने मुझे श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव की एक मृण्मूर्ति खरीद कर दी। बैठकखाने में सुसज्जित वह मूर्ति अतीव शोभायमान होती थी। बचपन से ही कृष्णनगर के मिट्टी के खिलौने, पुतली आदि मुझे बहुत अच्छे लगते थे। यही कारण था कि प्रतिवर्ष मेरी माँ मुझे अपने साथ रथ-मेले में लेकर आती एवं मेरे पसंदीदा खिलौने खरीद कर देती। इस बार मेरे पसंद की गुड़िया नहीं खरीदी जा सकी, अत: उसके स्थान पर तीन महामानवों की मूर्तियाँ मेले से ली गई – श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव, स्वामी विवेकानन्द और श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर। एकबार बैशाख मास में आने वाले तीव्र आँधी तूफ़ान से घर के पर्दों के उड़ने से स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति खंडित हो गई, उससे मेरा मन बहुत दु:खी हो गया। अब बैठकखाने में सिर्फ श्रीरामकृष्णदेव और रवीन्द्रनाथ ही रह गए। परवर्तीकाल में श्रीरामकृष्णदेव मेरे कक्ष में विराजित हुए और श्री श्रीरवीन्द्रनाथ हमारे बैठकखाने में। चूँकि वहाँ संगीत आदि की चर्चा होती थी अत: वे वहीं सुशोभित थे।

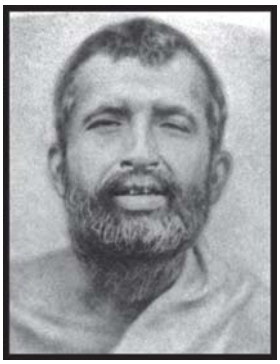

श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव

बाल्यजीवन की वह मृण्मूर्ति किसी दिन मेरे जीवन में चिन्मय हो उठेगी ऐसा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। एक दिन पन्नालाल भट्टाचार्य का श्यामा संगीत सुनते-सुनते न जाने कैसे मैं आवेगपूर्ण भाव से आच्छन्न होकर गिर पड़ी। तब स्वप्न के सदृश दर्शन हुआ – एक बाँस एवं मिट्टी से निर्मित गृह। उस घर में पाकशाला के बीच से विराट् बिल्ववृक्ष ऊपर की ओर निकला हुआ है और मैं खाना बना रही हूँ; वहाँ एक अन्य रमणी को देखा, मुझे बोध हुआ जैसे वे मेरी सास है। अकस्मात् ही वहाँ एक और सुपुरूष का आगमन हुआ उन्हें देखकर प्रतीत हुआ कि वे मेरे स्वामी है, उन्होंने मुझसे भोजन माँगा। उसके उपरांत देखा, मैं आहार का यत्नपूर्वक परिवेशन कर उन्हें खाने के लिए दे रही हूँ, वे प्रसन्नचित्त खाद्यादि ग्रहण कर रहे है एवं मैं उनको हाथ-पँखे से हवा कर रही हूँ। तभी मेरी सास आयीं और पुत्र के साथ स्नेहपूर्ण भाव से बातें करने लगी, मैं घूँघट में संयत होकर कुछ क्षणों तक बैठी रही, तत्पश्चात् दूसरे कक्ष में चली गयी। कुछ समय पश्चात् ही देखा, मैं फिर से उसी रसोईघर में नियमित कार्य कर रही हूँ, तभी न जाने किसीने मुझे पीछे से आवाज देकर कहा- ''सर्वाणी! आज पूजा का आयोजन करो, माँ की पूजा करूँगी।'' – आश्चर्यचकित होकर इधर-उधर देखा! वे महामानव तड़ित गति से अदृश्य हो गए। – मेरा स्वप्न भंग हो गया। सोचा, यह सब क्या है? कुछ गभीर भाव से चिन्तन करने पर आभास हुआ कि ये दीर्घकाय महापुरूष श्यामासंगीत के स्रष्टा कवि – श्री रामप्रसाद सेन है।

श्री रामप्रसाद सेन

मेरे साध्वी जीवन में परवर्तीकाल में मुक्तेश्वर महाराजजी ने एक रहस्यपूर्ण बात कही, ''माता ठाकुरानी, तुम्हारे पूर्वजीवन में यही नाम था तुम्हारा, 'सर्वाणी'। मैंने तुम्हारे उस हालिशहर में ही गंगा के तट पर पर्णकुटीर में रहने का मनस्थ किया है।'' यह बात सुनकर मैं अवाक् रह गयी।

बाल्यकाल से ही भगवान श्री किशोरी मोहन के प्रति मेरे हृदय में एक विशेष लगाव था, यही कारण था कि रामकृष्ण परमहंसदेव के प्रति मुझे इतने आकर्षण का अनुभव नहीं हुआ। भगवान किशोरीबाबा के जीवनी के माध्यम से मुझे अवगत हुआ कि भगवान किशोरी मोहन के साथ श्री रामकृष्णदेव का अनेक बार साक्षात्कार हुआ था। 'वृहत् किशोरी भागवत' में है –

''श्री भगवान की ज्येष्ठा भगिनी सुरधुनीदेवी का दक्षिणेश्वर में विवाह हुआ। उनका आवास कालीबाड़ी के निकट स्थित था, एवं श्री भगवान बीच-बीच में बहन के घर जाते थे। वहीं आने-जाने के दौरान श्रीश्रीरामकृष्ण परमहंस

देव के संग उनका परिचय हुआ।

परमहंसदेव से उनका परिचय है यह जानकर बहुत से लोग उनसे प्रश्न करते – 'वे धोती और कोट पहनकर बाबु की तरह रहते है, क्या वे प्रकृत साधु है?' श्रीश्री भगवान उत्तर देते – 'हाँ, वह सच्चा साधु है।' दक्षिणेश्वर में कालीबाड़ी घाट में नौका से उतरकर श्रीश्रीभगवान बहन के घर जाते। एक दिन परमहंसदेव उनके आने की संभावना को जानकर घाट में बैठकर कौतूहलवश प्रत्येक नौका के भीतर झुक-झुक कर देख रहे थे। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि श्रीश्रीभगवान के प्रति उनका विशेष आकर्षण था।''

सरोजबाबा

इसके पश्चात् एकदिन रामकृष्ण देव को स्वप्न में देखा। – 'मिट्टी का एक बड़ा खर से ढलाई किया हुआ घर। कक्ष के मध्य श्रीरामकृष्णदेव उपस्थित है और मैं भी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा – 'बहुत ठंड लग रही है, मेरे शरीर पर एक चादर डाल दो।'

मेरी निद्रा भंग हो गई। सोचा, श्रीरामकृष्णदेव और मैं यह कैसे संभव हो सकता है? इस घटना के दो वर्ष के मध्य जब मेरी उम्र २० वर्ष की रही होगी तभी एकदिन श्रीश्रीसरोज बाबा के साथ साक्षात् हुआ। एक दिन गभीर रात्रि में साधना करने के समय पहले घर को आलोकित करते हुए श्री भगवान पधारे, आकर मेरे सम्मुख बैठे और कहा – 'मेरा शृंगार कर दो।' मैंने देखा, मेरे बिछौने के समीप एक बड़ी चंदन की कटोरी है। उसमें से चंदन उठाकर श्री भगवान को सजा रही हूँ। हठात् देखा, श्री भगवान का स्वरूप परिवर्तित होकर उनके स्थान पर श्रीश्री सरोज बाबा मेरे सम्मुख बैठे है। सम्पूर्ण घर सुगंध से आमोदित हो गया। मेरे आश्चर्यान्वित होने पर उन्होंने स्मित हास्य से मेरे हाथों को स्पर्श किया इससे मेरा सूक्ष्म दर्शन भंग हो गया एवं मैं स्थूल चेतना में पुनः लौट आयी।

दूसरे दिन सरोजबाबा (सरोजबाबा को तब मैं 'बाबाजी महाशय' बोलती थी) आए एवं विभिन्न प्रसंगों पर बातचीत करते-करते मुझसे कहा, ''मुझे एक श्रीश्री भगवान किशोरीबाबा का फोटो देना।'' यह बात सुनने के साथ मैं मन ही मन में विस्मित हो उठी क्योंकि मेरे कक्ष में पूजा के स्थल पर श्री भगवान की एक ही फोटो थी एवं तब श्री भगवान का अन्य फोटो मिलना थोड़ा मुश्किल था। किंकर्त्तव्यविमूढ़ावस्था में ही मैंने श्री भगवान का फोटो बाबाजी महाशय को दे दिया। – उसी दिन से मेरे जीवन में शुरू हुई उस परम पुरूष की लीला प्रतिक्षण, प्रतिमुहूर्त एवं प्रत्यह!

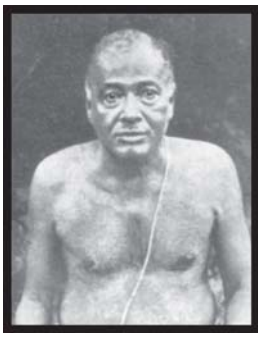
भगवान किशोरीबाबा

उसके पश्चात् मेरी योगदीक्षा हुई, विवाह हुआ, एक सन्तान एवं उसके बाद सन्यास हुआ। तत्पश्चात् मैं सॉल्टलेक स्थित फ्लैट में गयी। एक दिन पूजाघर की धूल झाड़ते हुए देखा कि श्रीरामकृष्णदेव की एक छोटी मूर्ति पर थोड़ी धूल जमी हुई है। तत्क्षणात् उसे लेकर बेसिन के नल से साबुन से धोकर ठाकुर को गायत्री मंत्र द्वारा स्नान करवाया। इसके बाद उन्हें पूजा के आसन पर बिठाया (मेरे आसन पर प्रतिष्ठित बाणलिंग-परमशिव) बाणलिंग शिव के साथ श्रीरामकृष्णदेव के मस्तक के ऊपर एक छोटा निखूत बिल्बपत्र देकर यथास्थान पर रख दिया। उसी दिन प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में दर्शन किया – एक भग्न प्राचीर के ऊपर श्री रामकृष्णदेव विराजित है और उन्हें अलौकिक समाधि का आवेश हुआ है एवं वे दिव्य भावस्थ अवस्था में कह रहे है – ''मैं ही शिव, मैं ही शंकर, मैं ही रूद्र!'' काला कोट परिहित हैं; कैसा अपूर्व भाव है! मेरा हृदय कंपित हो उठा एवं ध्यान भंग हो गया। तब भी मेरी देह में कम्पन हो रहा था। इस घटना के बाद मैं उस छोटे विग्रह को कपड़े पहनाकर भोग निवेदनपूर्वक जीवन्त मनुष्य के सदृश निष्काम भाव से सेवा करने लगी। तब मेरे संग उनके जन्मजन्मांतर के संबंधों के आधार पर अन्तर-लीला चलने लगी। उस समय से आज पर्यन्त उन परमपुरूष के निरंतर चिन्मय स्पर्श से मेरे अस्तित्व का प्रवाह प्रवाहित होकर चल रहा है काल के मध्य, एवं कालातीत अवस्था में।

परम पुरूष के निरंतर गभीर स्पर्श में,
काल-वक्ष पर प्रवाहित हो रही हूँ स्थिर अंर्तहर्ष से,
उन्हें बताती हूँ अपने हृदय का आंतरिक समर्पण,
कोटि-कोटि प्रणाम् के साथ सब हो आपने शरण।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (१५) : एकबार रात को दस बजे श्रीश्रीबाबा को गुरु माँ (श्रीश्रीबाबा की भार्या) ने रात्रि के खाने में मूँग की दाल और तीन रोटियाँ परोसी। श्रीश्रीबाबा ने खाना आरंभ किया। वहाँ पर असीम दा, गोपाल एवं गौर उपस्थित थे। हठात् बाबा ने दाल की कटोरी को जोर से दीवाल पर दे मारा। दीवाल थोड़ी सी टूट गयी एवं उस पर मूँग दाल के कुछ दाने चिपके रहे।

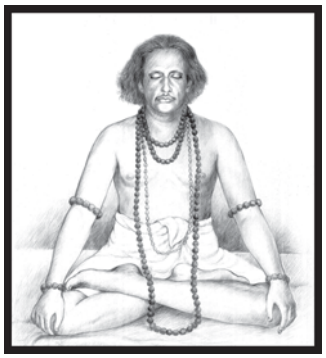

इसके दूसरे दिन प्रात:काल ही गाड़ी द्वारा बेहाला से मानिक, बूटा (मानिक का भाई) एवं बूटा की पत्नि आकर उपस्थित हुए। ये सभी लोग बाबा के परमभक्त हैं। वे अपने साथ बूटा की स्त्री की एक साड़ी भी लाए थे जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने उसे एक स्थान पर कैची से काट दिया हो और उस जगह पर मूँग के दाल के कुछ दाने भी चिपके हुए थे। इस सब चीजों को दिखाते देख असीमदा के समक्ष पूर्व घटित समस्त घटनाओं का मर्म स्पष्ट हो उठा। घटना कुछ इस प्रकार थी – गत रात्रि बूटा एवं उसकी भार्या के मध्य आपसी विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि मानसिक असंतुलन की अवस्था में बूटा की स्त्री अपने गले में साड़ी डालकर छत से झूल पड़ी। इधर उसी समय श्रीश्रीबाबा ने दाल की कटोरी फेंक कर उसके गले में लगे साड़ी के फंदे को फाड़ दिया जिससे बूटा की पत्नि मृत्यु के द्वार से लौट आयी।

प्रसंग (१६) : किसी एक रविवार की सुबह हमलोग श्रीश्रीबाबा के समीप बैठे थे, इसी समय रामराजातला शंकर मठ के पीछे स्थित मुखर्जी पाड़ा से दो भद्र महिलाएं, एक दस-बारह वर्ष के बच्चे के साथ वहाँ उपस्थित हुई। इनको श्री कालवर्ण लाहिड़ी ने भेजा था, जो श्रीश्रीबाबा के बालसखा थे एवं बाबा के योगैश्वर्य के संबंध में अवगत थे। उस बच्चे की एक आँख में काला मोतियाबिंद (ग्लोकोमा) ऐसी अवस्था में आ पहुँचा था कि डॉक्टर कहते थे कि उसकी यह आँख अति शीघ्र विनष्ट हो जाएगी। उसकी दूसरी आँख भी अति संकट में थी। उन दो भद्र महिलाओं में से एक, जो उस बालक की माता थी, श्रीश्रीबाबा के पास खूब रोने-धोने लगी। कुछ देर बाबा भावस्थ होकर उन सबों पर कभी-कभी दृष्टिपात करते; फिर अगले ही क्षण मानों किसी अदृश्य जगत में खो जाते थे। तत्पश्चात् श्रीश्रीबाबा ने अकस्मात् उस बालक की माँ से कहा, ''माँ, तुमलोगों के घर की छत तो टाली की है एवं घर में एक लौकी की लता है, उस लौकी की लता ने सम्पूर्ण छत को ढक रखा है, उस लौकी की लता में अनेक श्वेत पुष्प कुसुमित हैं। तुम उस सफेद फूल को तोड़कर उसका रस निकालकर इस शिशु के दोनों आँखों में कुछ दिनों तक डाल देना, तुम देखना आँखें स्वस्थ हो जाएगी।''

कुछ दिनों बाद की घटना – उन्होंने श्रीश्रीबाबा को आकर सूचित किया कि उसके पुत्र की आँखे पूर्णरूपेण स्वस्थ हो गयी हैं एवं चिकित्सक भी आश्चर्यपूर्वक कह रहे थे कि दोनों नेत्र एक साथ ही स्वस्थ हो गये।

जब हम सबों ने इस घटना के संबंध में श्रीश्रीबाबा से जिज्ञासा किया तो बाबा ने कहा कि उन सबों के वृतांत को सुनते ही उन्होंने उस बच्चे के नेत्रों को अच्छा कर दिया था। परन्तु वे सब सामान्य व्यक्ति हैं अतएव उनको रोग निवारण हेतु एक माध्यम बताना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने वह लौकी के पुष्प के रस का उपयोग बतलाया था। वह सब सिर्फ एक कहने की बात है। (श्रीश्रीबाबा की भाषा में – ''लौकी के फूल के रस की कोई बात नहीं, वह सिर्फ एक कहने-सुनने की बात है, जो कुछ अच्छा करना था वह तो मैंने उनकी बातों को सुनते ही कर दिया था। उनको कोई एक कारण तो बताना ही पड़ेगा।'') *...क्रमश:*

–श्री प्रदीप चट्टोपाध्याय, शिबपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आगामी अनुष्ठान सूची

बुद्ध पूर्णिमा— ४ मे, सोमवार
आध्यात्मिक सभा – २८ जून, रविवार
गुरु पूर्णिमा –३१ जुलाइ, शुक्रवार

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

गतांक से आगे–

(२२)

श्रीमाँ वहाँ आ गई और रानीमाँ से पूछने लगी –''क्या आपके लिए मिश्री का शर्बत बना दूँ? बहुत देर से आप यहाँ आई हुई हैं और मैंने सुना है कि आप जब यहाँ आती हैं, तो कुछ खाये बिना ही आती हैं। पूजा शेष होने में तो अभी भी बहुत देर है। इनको (ठाकुर) गंगा स्नान में भी पता नहीं कितना समय लगेगा!''

फिर रामकृष्णदेव की ओर मुखातिब होकर बोली, ''जाईये, जल्दी स्नान कर आइये, आपकी पूजा शेष न होने पर्यन्त तो ये (रानी रासमणि) कुछ भी स्पर्श नहीं करेंगी।''

श्रीरामकृष्णदेव खड़े होते समय सहास्य कह उठे, ''यह देखो, माँ भवतारिणी भी अवसर पाकर खड़ी होकर कह रही हैं-'जल्दी स्नान करके आओ'।''

रामकृष्णदेव के उठते ही रानीमाँ भी उठ गई और श्री माँ से कहने लगी, ''चलिए आपके कक्ष में चलते हैं। आपके लिए मैं स्वयं मिश्री का शर्बत बनाकर, आपको पिलाकर प्रसाद ले लूँगी।'' फिर नरेन से बोली, ''मथुरबाबु से कह देना, मैं अभी थोड़ी देर में सारदा माँ के कक्ष से होकर आ रही हूँ। नरेन, तुम क्या कुछ फल खाओगे? यहाँ आते वक्त मैं कुछ आम, केला, पपीता वगैरह लेकर आयी हूँ।''

(इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि सिद्धान्त ठाकुर अपने महाभावमय दिव्य-दृष्टि से रानी रासमणि कहकर जिसे सम्बोधित कर रहे है, सम्भवत: वह थीं वास्तव में मथुर-बाबु की अर्द्धांगिनी जगदम्बा देवी, जो रानी रासमणि की कन्या थी, जिनका रूप एवं शारीरिक सौष्ठव बहुत कुछ रानी रासमणि की तरह ही था। इनके साथ ही श्रीश्रीरामकृष्णदेव सखि-भाव की साधना करते थे। –श्रीश्रीमाँ सर्वाणी)

नरेन ने उत्तर दिया, ''नहीं रानी माँ, ये सब आप पूजा के लिए लाई हैं। मन्दिर में जो भी आता है, वह पूजा से पहले व्यवहार करना सही नहीं लगता। मैंने अभी-अभी गंगा जल सेवन किया है, अभी और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप चलिए, मैं मथुर बाबु को जानकारी दे देता हूँ।''

श्री माँ कुछ कह नहीं पाई और रानी माँ को साथ लेकर अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करने लगी।

रानी रासमणि श्रीमाँ से पूछने लगीं, ''वे (ठाकुर) आपको सदैव देवी कहकर ही पूजा करते हैं, क्या कभी स्त्री के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए?''

श्रीमाँ कहने लगी, ''मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नींद से उठकर किसी-किसी दिन देखती हूँ, वो मेरे पैरों के पास सोये हुए माँ-माँ कहकर रो रहे हैं। फिर कभी-कभी देखती हूँ, निद्रा में मेरे मस्तक को चूम रहे हैं। मेरी नींद उस समय इतनी गहन होती है कि मैं उनके किसी भी क्रिया-कलाप के विषय में प्रश्न नहीं कर पाती। उस समय पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, वह भी मैं समझा नहीं सकती।''

रानी रासमणि का सांकेतिक प्रश्न थोड़ा जटिल होने की कारण श्री माँ ने उत्तर दिया, ''नींद खुलते ही किसी-किसी दिन देखती हूँ, मेरे वक्ष पर कई पद्मफूल रखे हुए हैं और स्वामी गुरु पास ही गहन निद्रा में सोये हुए हैं। मैं भयभीत होकर पुकारती हूँ तो वे बिना ताके कहने लगते हैं – ''कौन? माँ, अभी आ रहा हूँ।'' फिर आँखे खोलकर मुँह पोंछकर कहने लगते हैं - ''तुम्हारे बिस्तर पर कैसे आ गया? इतने पद्मफूल कहाँ से आये? ये तो आज रानी माँ ने माँ के चरणों पर समर्पित करने को दिये थे। वे सोलह पद्मफूल यहाँ कैसे आ गये? यह सब कहते-कहते किसी किसी दिन इतने रोने लगते है कि मेरी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। इसीलिए कहती हूँ, स्वामी गुरु के काम-काज का कोई हिसाब लिया नहीं जा सकता। मुझे स्वयं भी कुछ समझ में नहीं आता तथा मैं अन्य किसी को भी समझाने में असमर्थ हूँ।''

ठीक इसीसमय नरेन एवं मथुर बाबु आकर कहने लगे, ''ठाकुर महाशय का गंगास्नान तो आप देख नहीं सकी, किस तरीके से उल्टे होकर, चित होकर, माथे को जल के भीतर रखकर और पाँवों को ऊपर उठाकर काफी समय तक माँ गंगा की मुद्रा द्वारा पूजा करते-करते पता नहीं कहाँ जल के अन्दर आधे घण्टे तक अदृश्य हो गये, हमें तो कोई नामो-निशान दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही आपलोगों को बुला लाने की मन में इच्छा जगी, वैसे ही देखा वे बीच गंगा में तैर रहे है । उनके कार्यकलाप एवं पूजा पद्धति सबकुछ ही मानों वेद-वेदान्त के परे है। और भी कितना कुछ घटित

हो गया। अभी ये सब बातें कही नहीं जा सकती। आइऐ, वे पूजा के कक्ष में आ गये हैं। आज फिर इतने रो रहे हैं कि उनसे इसका कारण पूछने का साहस भी नहीं हो रहा। सारदा माँ –आप भी आईये।''

सारदा माँ आँसू पोंछते-पोंछते कहने लगी –''हाँ, हाँ मैं भी रानी माँ के साथ चलूँगी, तुमलोग थोड़ा मिश्री का शरबत पीकर जाओ।''

इतनी देर में मन्दिर प्रांगण में नहवत बजने लगे। सभी अश्रुपूरित आँखों से पूजा कक्ष में आकर उपस्थित हुए।

...क्रमशः

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

उन्मेष

(१०)

माघी पूर्णिमा - ९।२।२००९

एक भक्त ने श्रीश्रीमाँ से पूछा, ''माँ, साधु-सन्त कहते हैं कि निष्काम होकर ही भगवान को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हमें कैसे निष्काम होना चाहिए?''

श्रीश्रीमाँ – नहीं, तुमलोगों को निष्काम नहीं होना होगा, तुम सभी सकाम ही रहो। सकाम से सत्कर्म करो, सद्गुरु प्रदत्त क्रियादि नित्य करो। भगवान की पूजा-पाठ आदि करो। भगवान के अस्तित्व को स्मरण करना, सभी एक-दूसरे से प्यार करना, अपने अभ्यन्तर की आसुरिक वृत्तियों की ओर सतर्कता से गौर करना ताकि वे हावी होकर तुमसे कुछ दुष्कर्म या कुकर्म न करवाऐ। सच्चे साधु सन्तों का संग कर धर्म कर्म करने से धर्म-अर्थ-कामादि चतुवर्ग फल प्राप्त किये जा सकते हैं। 'मोक्ष' तो बहुत दूर की बात है। इस पार्थिव विलास को अतिक्रम कर सकने से ही मोक्ष का पथ प्राप्त होगा। सत्कर्मों की पूँजी रहने से अन्त में पार्थिव सुख-शान्ति प्राप्त होगी। मनुष्य यदि सकाम नहीं रहेंगे तो यह पृथ्वी चलेगी कैसे? तुमलोगों के लिए ही तो इस पृथ्वी की धारा अभी भी चल रही है।

मनुष्य जब दु:ख दुर्दशा से जर्जरित होकर हाहाकार करते-करते आकुल होकर भगवान को पुकारता है तब कभी-कभी भगवान भक्त वेश में आकर त्राण करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे प्रकृत भक्त ही सद्गुरु होते हैं। भगवान के राज्य में चिरस्थायी रूप में जाने के लिए, निवास करने के लिए, कठिन कठोर तपोबल से एवं भक्ति प्रेम की शक्ति से साधक की इस ब्रह्माण्ड की सारी क्षुधा शमित हो जाती है। तब भगवान की कृपा से वह ब्रह्म-निर्वाण पद प्राप्त कर भगवान के ऐश्वर्य एवं माधुर्य के राज्य का चिरस्थायी निवासी होने के लिए निर्वाचित होता है।

'ब्रह्मनिर्माण' – सत्ता का सर्वशेष परिणाम, कैवल्य का अपर नाम है। नित्य के महात्मा भगवत्कल्प महात्मा होते हैं। सिर्फ वे ही कैवल्य अवस्था प्रदान कर सकते हैं। भगवान के पक्ष में असाध्य कुछ भी नहीं है। श्री भगवान की इच्छा से पशु-पक्षी भी कईबार कैवल्य अवस्था लाभ करते हैं। नित्य की भूमि पर भी ऐसा ही कुछ होता है। प्रभु जगद्बन्धु सुन्दर एकबार एक गाय के शरीर का सहारा लेकर निद्राभिभूत हो गये। दूसरे ही दिन उस गाय का देहान्त हो गया। इससे प्रभु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपने संगियों से पहले ही कह दिया था कि वह नित्यधाम को प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी उपलब्धि से यह भी बताया कि नित्यलोक में उन्होंने रत्नालंकार से भूषित गाय का दर्शन किया। वे सभी गाभीगण चिन्तन की तरंगों की सहायता से पूर्णज्ञान का विषय कहने में सक्षम हैं। अनेक क्षेत्रों में देखा गया है कि जब श्रीभगवान मर्त्य लीला के लिए धरा-धाम पर अवतरण करते हैं तब ये जीवगण मनुष्य देह धारण कर धरा पर आकर श्रीभगवान के सान्निध्य से भक्तरूप में साधना भी करते हैं। तब वही जीवगण नित्य का भगवत्तुल्य मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त कर एवं भगवत् सेवा में नित्यस्थित होकर नित्य अवस्था में निमज्जित रहते हैं।

मुझे लगता है, सृष्टि के नियम में प्रकृति में समर्पित चित्त साधारण पशुपक्षीरूपी जीव की सत्ता निष्काम अवस्था में अवस्थान करने की वजह से ही भगवत्सान्निध्य में वे अनायास नित्य में पहुँच सकते हैं। मनुष्य सत्ता में प्रवृत्ति की उत्तेजना से सकामता आने के कारण ही मनुष्य सत्ता को भगवत्धाम मिलने में विलम्ब होता है। साधारण पशु-पक्षियों में जो सरलता रहती है, मनुष्य के अन्तर में चिन्तन की वह सरलगति नहीं रहती सम्भवत: इसीलिए ऐसा होता है।

कठोर तपस्या द्वारा योगी साधक को पहले स्थितप्रज्ञ आसन पर समासीन होना पड़ता है, स्थितप्रज्ञ के आसन पर उपवेशन कर सकने से साधक के पक्ष में निष्काम भक्तियोग की साधना होती है। अन्तर में ज्ञानाग्नि के आलोक से ही योगीसाधक भक्तिपथ प्राप्त करता है। यह ज्ञानाग्नि ही है आत्मसत्ता के अस्तित्व बोध की चित्अग्नि। इस प्रज्ञानमय चिदग्नि के आलोक में जब योगी का हृदय उद्भासित होता है तब योगी के अन्तर में समस्त संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं। सकल संस्कार भस्मीभूत होने पर ही अन्तर में हृदय के चिदाकाश में प्रज्ञान आदित्य का प्रकाश होता है। उस आदित्य ज्योति के आलोक में योगी हृदय में ध्रुवज्ञान का स्फुरण होता है एवं इस अवस्था में अटलरूप में स्थितिलाभ कर सकने के पश्चात् ही योगी योगयुक्त अवस्था में स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त करता है।

श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा द्वारा प्रदर्शित पथ क्रियायोग-रूप ब्रह्मविद्या के साधन सोपान में तृतीय स्तर से ठोक्कर एवं ग्रन्थि उन्मोचन की जो सकल परावस्था की क्रिया कौशलादि है वे सभी लययोग के अन्तर्गत है। इनका ठीक से साधन करने पर हृदय में प्राण स्थिर होकर परासम्वित् के संग सम्मिलित होता है एवं इस अवस्था में ही योगीगण धारणा में उपनीत होकर ध्यान गम्भीर अवस्था में अन्तश्चेतना को असीम की ओर धावित करने में सक्षम होते हैं, अर्थात् ससीम से असीम चेतना में योगीगण साधक तब युक्तावस्था प्राप्त होते है, तब योगी की एकप्रकार की 'समाधिस्थ केवलम्' अवस्था होती है। तब सत्तामध्य प्राणों का गतिरोध होकर सिर्फ परासम्वित्रूपी स्पन्दन रहता है। तब सत्ता में बोध का जो स्फुरण होता है वह सभी ध्रुव है। यही है स्थितप्रज्ञा की परिपक्व अवस्था।

माया के जगत् में साधारण भक्तिभाव साधक को पथभ्रष्ट कर सकता है। ज्ञान-भक्ति है प्रकृत भक्तियोग का पथ।

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

पुराण कथा

महर्षि श्यावाश्व

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

अत्रिवंशीय महर्षि श्यावाश्व ऋग्वेद के अन्यतम मंत्र द्रष्टा ऋषि थे। उन्होंने प्रधानत: मरूतगणों की (मरूद्गण कश्यप और दिति के पुत्र, देव तुल्य शक्तिमान देवतागण, ये सब देवराज इन्द्र के सभा को अलंकृत कर वहाँ अवस्थान करते।) स्तुति कर बहुत से ऋक् मंत्रों की रचना किया, इसके अतिरिक्त अग्नि एवं अन्यान्य देवगणों के स्तव द्वारा कतिपय ऋक्मंत्रों की रचना किया।

महर्षि श्यावाश्व के संबंध में सायनाचार्य ने एक उपाख्यान उद्धृत किया है। – श्यावाश्व के पिता अर्चनाना ऋषि एकबार दर्भ तनय राजा रथवीति के यज्ञ में पुरोहित के रूप में नियुक्त हुए थे। श्यावाश्व भी उस यज्ञ में पिता के समीप उपस्थित थे। उसी समय अर्चनाना ने नृप रथवीति की कन्या को पुत्र श्यावाश्व की भार्या हेतु नृप से प्रार्थना किया। इस प्रस्ताव पर रथवीति के राजी होने पर भी रथवीति की पटरानी ने आपत्ति पूर्वक कहा कि उनकी सभी कन्याओं का परिणय तो ऋषिगणों के साथ हुआ है; इसीलिए श्यावाश्व जब तक ऋषित्व की उपलब्धि नहीं कर लेते तब तक उनकी कन्या का विवाह उनके साथ होना संभव नहीं है। राजसभा में इसप्रकार पिता का अपमान होने पर श्यावाश्व ने तब सब कुछ जान कर राजकुमारी को प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या का अवलंबन किया। इस दौरान उन्होंने एक बार भिक्षार्थ पर्यटन करते हुए राजा तरंत या तरण्ड और उनकी महिषी शशियशी से गोमुख, आभरण एवं बहुमुल्य रत्न प्राप्त किया। ततपश्चात् श्यावाश्व ने शशियशी के परामर्श से उनके अनुज पुरुमींथ के समीप गमन किया। गमन काल के पथ में उनके द्वारा मरूत्गणों का साक्षात्कार कर उनको स्तव द्वारा संतुष्ट करने पर मरूद्गणों ने प्रसन्न होकर उन को 'ऋषि' पद की स्वीकृति प्रदान की। तदावधि वे मंत्रद्रष्टा के रूप में प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात् ऋषि श्यावाश्व के साथ राजकुमारी का विवाह सुसम्पन्न हुआ।

महर्षि श्यावाश्व अत्रिवंशीय गोत्र प्रवर्तक ऋषिगणों के अन्यतम आर्ष-प्रवर।

(सहायक ग्रंथ 'ऋग्वेद-५-६१ टीका' व 'मत्स्यपुराण')

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

काशीधाम में पंचकोशी

(३)

हमारी पंचकोशी परिक्रमा के दौरान सबसे पहले हमने केन्दूया ग्राम में अवस्थित अति पुरातन शिवमन्दिर जो कि 'कर्दमेश्वर महादेव' के नाम से भी ख्यात है उनका अत्यंत भक्ति-भाव से दर्शन किया। मन्दिर के नज़दीक में ही था अनेक वर्ष पूर्व निर्मित तालाब। हम लोगों ने मन्दिर में प्रवेश कर शैवतीर्थ की परिक्रमा करते हुए पहले शिवलिंग का दर्शन किया। प्राचीन वटवृक्ष की छाया में अवस्थित महादेव मन्दिर के पास खड़े रह कर, तालाब के प्राकृतिक सौन्दर्य का उपभोग करते हुए उस कोलाहल मुक्त शान्त परिवेश में थोड़ी आत्मिक आनन्द की उपलब्धि की। इसके पश्चात् हम अपने परवर्ती तीर्थस्थान की ओर लक्ष्य कर आगे बढ़े। उपलब्ध शास्त्रों के अनुसार यह 'कर्दमऋषि' की तपस्या का पुण्य स्थल था एवं यह शिवलिंग उनके कर-कमलों द्वारा ही प्रतिष्ठित था। गाड़ी में बैठने के कुछ समय पश्चात् ही हम लोग 'भीमचण्डी' मन्दिर पहुँच गए। गाड़ी से उतरकर हम लोग मन्दिर को अपलक निहारते रहे उसका कारण था मन्दिर में की गई बारीक किन्तु सुस्पष्ट कारीगरी जिसे देखते-देखते हम लोगों ने ना जाने कब भीमचण्डी माता के दर्शन हेतु मन्दिर में प्रवेश किया हमें ही पता न चला। उसके पश्चात् वहाँ प्रतिष्ठित एवं नित्य पूजित शिवलिंग के दर्शन और परिक्रमा कर गाड़ी के पास पहुँचे। हमारा अगला गंतव्य तीर्थस्थल पास में ही था अत: हम लोग अल्प समय में ही 'भैरवनाथ' मन्दिर के दर्शन हेतु पहुँच गये। शैवतीर्थ काशीधाम में विभिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न नामों से अभिहित शिवलिंग मन्दिरों में प्रतिष्ठित हैं, उनके क्षेत्रपाल, के रूप में उस धाम की रक्षा करते है भैरव देवगण। आदिकाल से ही अन्यतम प्राचीन मन्दिरों में भी भैरवनाथ जी को रक्षक के रूप में पूजने के दृष्टांत मिलते है। वहाँ दर्शन और प्रणाम निवेदन कर मन्दिर का परिदर्शन करके समीप में ही स्थित तालाब जो कि 'भैरव तालाब' के नाम से परिचित है वहाँ जाकर खड़े हो गये। नीरव मन्दिर के बाहर का परिवेश मंद-मंद प्रवाहमान सुशीतल पवन से सुखद प्रतीत हो रहा था तथा बहुत से ग्रामीण परिवार साधु दर्शन की आकांक्षा से तालाब को पार कर वहाँ आ पहुँचे। शांत और गभीर भैरव तालाब बीच-बीच में मन्दिर के घण्टे की गूंज से गूंजायमान हो उठता था। हम सभी अल्प समय में ही मन्दिर का दर्शन कर दरवाजे के बाहर आ गये। मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु धनराशि देना हमारी प्राचीन काल से चली आ रही परम्परा है अत: हम लोगों ने भी सभी मन्दिरों में दान-राशि समर्पित की। कुछ ही दूरी पर अवस्थित एक ग्राम में सृष्टिकर्त्ता 'श्रीश्रीब्रह्माजी' का प्राचीन मन्दिर एवं उसके मध्य में शिवक्षेत्र के प्रमाण स्वरूप अति प्राचीन पूजित एक शिवलिंग शोभायमान हो रहे थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर पाण्डु पुत्र 'भीम' का भी एक मन्दिर था। उस मन्दिर से हमारी प्राचीन उन्नत कला सौन्दर्य की झलक मिल रही थी। प्राचीन तीर्थस्थान काशीधाम में देवी-देवताओं के आगमन के संबंध में पंचकोशी परिक्रमा के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जान सके। शिवरात्रि के दिन अनेक साधु-सन्तों ने पैदल ही परिक्रमा की, उसके पश्चात् पवित्र गंगा का स्नान कर गंगाजलस्थ दूध, दही, मधु (इसे पंचामृत कहा जाता है) और बिल्व पत्र से बाबा विश्वनाथजी की पूजा की। हमारी गाड़ी परवर्ती तीर्थ स्थान 'कामेश्वर महादेव' मन्दिर की ओर बढ़ चली। गाड़ी में व्यतीत कुछ घण्टों की यात्रा के पश्चात् हमें भूख लगने लगी। हम लोगों ने निश्चय किया कि आगामी तीर्थस्थल के दर्शन के बाद अल्पाहार लेंगे। १५ मिनिट के पश्चात् ही हम लोग मन्दिर के समीप पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि 'कामेश्वर महादेव' मन्दिर के पास ही सिद्धिदाता गणेशजी, 'शीतलामाँ' और संकटमोचनकारी वीर हनुमानजी का पूजित मन्दिर था। 'कामेश्वर महादेव' के मन्दिर में प्रत्येक सोमवार को पूजा-अर्चनार्थ अनेक भक्तों का समागम होता है, जो कि दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से समाहित हुए लोगों की भक्ति का परिचायक है। हम लेगों ने प्रत्येक मन्दिर में भक्ति भाव से

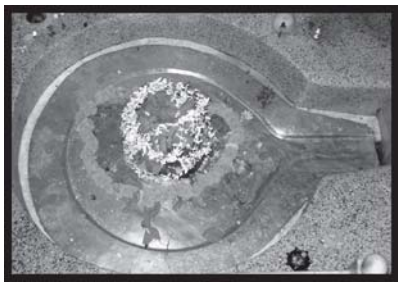

रामेश्वर महादेव

दर्शन कर गाड़ी की ओर प्रस्थान किया।

अपार जन समुह के बीच से हमारे गाड़ी चालक ने बड़ी दक्षता के साथ गाड़ी निकालकर हमें 'काल भैरव' तथा लक्ष्मीनारायण मन्दिर के समीप पहुँचा दिया। उस यात्रा के दौरान पूर्व में भी हमने भैरव मन्दिर देखा था जो कि पंचकोशी परिक्रमा में 'कालभैरव' नाम से विख्यात है। उसके कुछ ही दूरी पर 'लक्ष्मीनारायण' मन्दिर है। पुरोहित महाशय पूजा समाप्त कर दरवाजे पर ताला देकर चले गये। लेकिन उस तीर्थ के भगवान इतने दयामय है कि तीर्थयात्रियों के दर्शन देने के निमित्त प्राचीन मन्दिर के काठ के दरवाजे में एक छिद्र तैयार कर रखे है वहाँ से भगवान के दर्शन सुलभता से हो पाते है। हमलोगों को भी दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं हुई। बहुपुरातन उस मन्दिर में जहाँ चहुँओर शान्ति का राज्य स्थापित था जिससे ईश्वरानुभूति का आभास मिल रहा था। तीर्थस्थानों का दर्शन कर ही हम वहाँ के महात्म्य को समझ सकते है। दूर-दूर के क्षेत्रों व ग्रामों से इन तीर्थस्थलों के दर्शन हेतु भक्तों की आवाजाही थमने का नाम ही नहीं लेती। हम लोग जब काशीधाम में पहुँचे तो देव दरबार से शीत ऋतु विदा होते हुए ऋतुराज वसन्त के आगमन की सूचना दे रही थी। जिससे सूर्य किरणों के ताप संचार, वृक्ष के गिरे पत्तों के ढेर तथा मंद-मंद शीतल वसन्त समीर का प्रवाह अनुभूत हो रहा था। हमलोगों ने इसी स्थान में रास्ते के नज़दीक दुकान में कुछ खाकर चाय पी। इसके पश्चात् हम लोग अपने लक्ष्य 'रामेश्वर महादेव' के मन्दिर की ओर बढ़ चले। कुछ दूरी तय करने के बाद आखिर में हम अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच ही गए। मन्दिर अंचल में पहुँचकर हम लोग मन्दिर प्रांगण में गये। वहाँ छोटे-छोटे अनेक देवी-देवताओं के मन्दिरों के साथ थे 'रामेश्वर महादेव' जो भगवान श्रीरामचन्द्रके हाथों द्वारा प्रतिष्ठित किये गये थे। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि, भगवान श्रीविष्णु के अवतार श्रीरामचन्द्रजी की वहाँ उपस्थिनि का कारण क्या रहा होगा? मन्दिर के मध्य में पीतल की पात से मोड़कर निर्मित किए गए शिवलिंग और उनकी वेदी। वही पर पुरोहित महाशय ने हम लोगों को मंत्रपाठ कर पूजा करवाई। समीप में ही महादेव के होमकुण्ड से विभूति लेकर हम लोगों को प्रदान की एवं हमारे प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में अति प्राचीन कहानी सुनाई – त्रेता युग के अवतार श्रीरामचन्द्र क्षत्रिय वंश की संतान थे। ब्राह्मण वंश की संतान और शिव के परमभक्त एवं उपासक, लंका के राजा रावण का वध कर श्रीराम परवर्ती कर्मफल के क्षय के उद्देश्य से काशीधाम गये, इसी पंचकोशी परिक्रमा के पथ में वरूणा नदी के तीर पर एक मन्दिर की स्थापना कर शिवलिंग प्रतिष्ठित कर अपने हाथों से पूजा की। उसी समय से यह शिवलिंग 'रामेश्वर महादेव' के नाम से जाना जाता है। नाटोर की रानी भवानी ने काशीधाम में अवस्थानकालीन समय में एक सुन्दर 'माँ दुर्गा' की मूर्ति प्रतिष्ठित की, जो आज तक नित्य पूजित होती चली आ रही है तथा नवरात्रि में एकत्रित भक्तों का उत्साह तो देखते ही बनता है। पास में ही काले पत्थर से निर्मित 'कड़िमाता' की मूर्ति अवस्थित है। पुरोहित महाशय से इस मूर्ति के विषय में एक रहस्य का उद्‌धाटन हुआ कि यह मूर्ति इस पुण्य भूमि से ही प्रकट हुई है। परस्पर पास-पास में स्थापित दोनों देवियाँ उसी मन्दिर में पूजित होती है। हम लोगों ने मन्दिरों के दर्शन कर वरूणा नदी के तीर पर बंधे घाट से जल लेकर आचमन किया तथा नदी के पार के प्राकृतिक दृश्य का सानन्द उपभोग किया।

...क्रमश:

–स्वामी संवेदानन्दजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

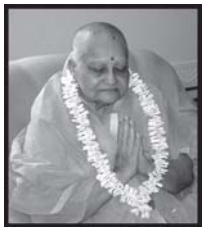

श्रद्धार्घ्य

परम श्रद्धेया श्रीश्रीज्ञानानन्दमयी माँ ने ८ फरवरी,२०१५ को अपने स्थूल शरीर का त्याग किया। श्रीश्रीमाँ के साथ उनके आत्मीय सम्बन्ध थे। अखण्ड महापीठ में आयोजित कुछ उत्सवों पर उनका सान्निध्य पाकर हमलोग धन्य हुए। उनका शिशुसुलभ आचरण हृदय-स्पर्शी था। उनके सरल हृदय आग्रह को स्वीकार कर श्रीश्रीमाँ भी एकबार उनके सोनारपुर स्थित आश्रम में पधारी।

भगवान स्वप्रकाशमय

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीकृष्ण के शैशवकाल में एकदिन नन्दालय में यशोदा पुत्र को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थीं, उस समय कई वृद्धाएँ एवं बालिका गोपिकाएँ नंद गृह आयीं। माता यशोदा ने उन लोगों को देखते ही पुत्र को शय्या पर शयन करा कर गोपिकाओं का सादर सुस्वागत किया। शिशु श्रीकृष्ण की अभी दुग्ध पान की इच्छा पूरी नहीं हुई थी; वे क्षुधार्त होकर युगल पदों को शय्या पर प्रहारित करने लगे। शिशु कृष्ण के पद प्रहार से समीप रखा एक शकट भू-पतित होकर टूट गया एवं शकट के ऊपर रखे दधि, नवनीत आदि के भाण्ड गिर कर चूर्ण हो गये। यह सब देखकर समागत गोपिकागणों ने भयभीत एवं अतीव आश्चर्यान्वित होकर यशोदा से शकट भग्न होने का कारण जानना चाहा। यशोदा ने जब कहा कि उनके पुत्र के पदाघात से शकट भग्न हो गया है, तब उन सबों ने यशोदा की उक्ति पर पूर्ण विश्वास न कर उस पर हास्य प्रदर्शित किया। अतएव इस घटना की चर्चा सब तरफ होने लगी। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणगण ने आकर स्वस्ति वाचन कर शिशु के हाथ में एक सर्वमंगलप्रद कवच बाँधा।

जन्मकाल से ही श्रीकृष्ण के अलौकिक शक्ति का प्रकाश देखा जाता है। भगवान श्रीकृष्ण परिपूर्णतम अवतार तथापि मायिक जगत् में माया का ऐसा ही प्रभाव कि वेद-वेदांग पारंगत ब्राह्मण भी भगवान के अलौकिक प्रकाश को प्रारंभ में समझ न पाये। भू-भार हरण करने हेतु धरणी के अनुरोध पर श्रीकृष्ण ने भूमण्डल में जन्म ग्रहण किया था। वे ही तो सर्वमंगलमय एवं सर्वमंगलप्रद; उनके मंगल हेतु पुनः कवच की क्या आवश्यकता थी? शिशु पर अशुभ शक्ति के प्रभाव की आशंका से अथवा हो सकता है अन्य कोई शिशु को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुँचा पाए इसी कारण से ब्राह्मणगणों ने सर्वमंगलप्रद कवच उनके हाथ में धारण कराया। भगवत् लीला से सभी अवगत नहीं हो सकते। एकमात्र उस परम की असीम अनुकम्पा न होने पर अथवा भगवत्कृपा एवं भगवत् इच्छा बिना, भगवान के स्वरूप को कोई जान नहीं सकता।

(सहायक ग्रंथ 'ब्रह्मवैबर्त पुराण')

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(६)

गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः।
गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं यथावै विनियोजितम्।। २१

गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म, प्रसादतः (एव) प्राप्यते (लभ्यते) (तद्धेतोः) गुरुमूर्ते यथावै विनियोजितं सदाध्यानं (कुर्यात्) (गुरुमूर्तिध्यानात् ब्रह्म प्रसन्नं भवतीत्यर्थं) २१

–अर्थात्, सत्य स्वरूप ब्रह्म का मुख उस ज्योतिर्मय ब्रह्मपद पर आच्छादित रहता है, (ईशोपनिषत् १५ श्लोक देखो – ''हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्), गुरुमूर्ति, उस ब्रह्मपद में एकान्त ध्यान द्वारा ब्रह्म के प्रसन्न होने से ब्रह्मलाभ होता है; अतएव गुरुमूर्ति के ध्यान में सदा निरत रहोगे।।२१

स्वाश्रमोक्तं, स्वजातिंच, स्वकीर्तिं, पुष्टिवर्द्धिनीम्।
अन्यत् सर्व्वं परित्यज्य गुरोरन्यं न भावयेत्।।२२

स्वाश्रमोक्तं स्वजातिंच स्वकीर्तिं पुष्टि वर्द्धिनीं, यत् यत् कर्म, (ततः) अन्यत् च यत् जगत्-संबंधित कर्म (अस्ति), तत् सर्व्वं परित्यज्य (गुरुमेव भावयेत्), गुरोरन्यं न भावयेत्।।२२

स्वाश्रमोक्त धर्म – औदार्य भाव परित्याग कर निज आश्रमोक्त धर्म पालन में बद्धभाव में अवस्थिति; स्वजाति धर्म – 'उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्' तद्भाव सम्पन्न नहीं, केवल निज जातिगत धर्म में बद्ध रहकर सर्वगत ब्रह्मज्ञान से वंचित होकर अवस्थान करना; स्वकीर्ति – स्वयं की प्रतिष्ठालाभ के लिए यत्न करना; पुष्टिवर्द्धिनी कार्य – शरीर को आत्मबोध से पुष्टिसाधन कराने के लिए सचेष्ट रहना एवं अन्यान्य सर्व प्रकार की बद्धजीवोपयोगी क्रियाओं का परिहार करते हुए गुरुध्यान में रहोगे एवं वाह्य कार्य कर रहा हूँ पर वाह्य विषय प्राप्ति के लिए नहीं, परन्तु

उस कृतकर्म के परिणाम के प्रति लक्ष्य न रखते हुए निष्काम भाव में करना होगा; अतएव अन्य भावना न करते हुए गुरुध्यान में निरत रहना होगा।।२२

गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्यानुलभ्यते।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु।।२३

गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या, (सा) गुरुभक्त्या अनुलभ्यते,
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरोः आराधन कुरू।।२३

गुरुवक्त्रे विद्या (सत्यज्ञान अर्थात् ब्रह्म सत्य एवं जगत् मिथ्या, ऐसा ज्ञान – यह काल्पनिक भाव से विद्या की उपासना द्वारा प्राप्त नहीं होता, वरंच प्रत्यक्षभाव में ब्रह्मदर्शन से ही होता है – (ईशोपनिषत् ९म श्लोक देखो) पूर्ण सत्यज्ञान ब्रह्मदर्शन में अवस्थान कर रहा है, गुरुभक्ति के द्वारा यह लाभ होता है; इस कारण सर्व प्रकार प्रयत्न द्वारा गुरुकी आराधना में रत रहना उचित है। २३

त्रैलोक्यस्फुटवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगाः।
ध्रुवं तेषांच सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्।।२४

त्रैलोक्ये ये स्फुटवक्तारः सन्ति तथा ये देवाद्यसुरपन्नगाः (विद्यन्ते), तेषामपि सर्वेषां तत्त्वं गुरोः परं न अस्ति इति ध्रुवम्।।२४

जगत् अन्तर्गत स्वर्ग, मर्त्य, पाताल – इन तीन लोकों में देवता, असुर व पन्नग प्रभृति विविधरूपों में दृष्टिगोचर होते हैं, इन सब जीवों के स्वरूप की प्रत्यक्षरूप में उपलब्धि नहीं हो पाती, परन्तु परोक्षभाव में वाक्य के द्वारा (वाह्य भाव में) इनका स्फुरण होता है; अर्थात्, बातचीत से अथवा अन्य प्रकार से वाह्य लिंग के द्वारा उनसब का अस्तित्व समझा जा सकता है। उनसब का स्वरूप मायिक रूप के द्वारा आवृत रहता है इसीलिए जीव के निकट वह अप्रकाशरूप में रहते है, एवं वे निजबोधरूप भी नहीं है; यथा – मृतदेह दर्शन से प्राण की अवगति नहीं होती है, परन्तु देह की बात करने पर अथवा अन्य प्रकार वाह्य लिंग के द्वारा देह में जीवसत्ता का वर्तमानत्व प्रकाशित होने से, प्राण के अस्तित्व के विषय में समझा जा सकता है। प्राणरूपी जीव का स्वरूप मायिक रूप के द्वारा आवृत है इसीलिए यह अप्रकाश भाव में रहता है एवं यह भी निजबोधरूप नहीं है, यथा मृतदेह दर्शन से प्राण की अवगति नहीं होती परन्तु देह के परिप्रेक्ष्य में अथवा अन्य प्रकार जीवन्त लक्षण देह में प्रकाशित होने से देह के मध्य प्राण की सत्ता की अवस्थिति समझी जाती है तथापि प्राण के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है, वह ब्रह्मदर्शन में निजबोधरूप से ज्ञात होती है। इस कारण वाह्याकार में दृश्यमान उस समस्त वस्तुओं के तत्त्व सकल श्रीगुरुतत्त्व की अपेक्षा श्रेष्ठ हो नहीं सकते। त्रिलोक में जो कोई समस्त तत्त्वों का विशदभाव में ज्ञाता कहकर परिचित है, उन्होंने भी गुरु की सहायता से ही इसरूप में प्रकाशक की अवस्था लाभ की है; अतएव उनसब के तत्त्व भी अप्रकट गुरुतत्त्व के अतिरिक्त नहीं है। २४ *...क्रमशः*

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

परमब्रह्म के साक्षी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गतांक से आगे–– **(२७)**

देहाभ्यंतरस्थ ४९ वायु के स्पन्दन से ही ४९ मातृकावर्णों की ध्वनियों का विकास हुआ है; और तीन ९, ६, ७ कला सदृश सहस्रार स्थित पूर्णचन्द्ररूपी सदाशिव की अर्द्धमात्रा रूपी स्पन्दन। ४९ वायु का स्पन्दन स्थिर अवस्था को प्राप्त करता है नासिकाग्र पर अथवा तालुकूहर स्थित ललनाचक्र (४९ दल-लोहितवर्ण के पद्म) पर; ४९ वायु का स्पन्दन का रूप दर्शित होता है ललनाचक्र और आज्ञापद्म के कपालकूहर के मध्य भाग अथवा थोड़ा ऊपरिभाग के अंधकाराच्छन्न आकाश में क्षुद्रातिक्षुद्र नक्षत्र बिन्दु के रूप में।

उत्तम प्राणायाम के फलस्वरूप शीं शीं नादध्वनि श्रुत होती है। उस अवस्था में कूटस्थ में दृश्यमान गगन भेद करने पर एक शुभ्र ज्योतिर्मय अखण्ड ज्योति का आकाश देखा जाता है। उस आकाश के मध्य अजस्र स्वर्णाभ बिन्दु के सदृश ज्योति पुंजाकर रूप में दर्शित होती है एवं इन बिंदुओं से गंभीर महानाद की ध्वनि सुनाई देती है। निरंतर उस ज्योतिर्मय आकाश में दृष्टि निबद्ध करने पर मध्य का अंश विदीर्ण होकर अखण्ड मण्डलाकार 'माँ' रूपी परानाद ज्योति आद्याशक्ति का ज्वलंत ज्योति के रूप में दर्शन होता

है; तत्पश्चात् हठात् तिमिरालोक मिश्रित आकाशमण्डल के मध्यांश में गाढ़े काले रंग का घूर्णायमान गोलक एवं उसके परित: अथवा पीछे ज्वलंत सूर्य-प्रभा-सम ज्योति (सूर्यग्रहण के समय जैसा दर्शन होता है) बहुत समय तक दर्शित होती है। मध्य में स्थित घूर्णायमान काले गोलक की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है; इस गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण से सत्ताबोध जैसे द्रुतगति से उसकी ओर कर्षित होने लगता है; यही विष्णु नाभि है; मध्य में स्थित काले गोलक से ही काल का उद्भव और सृष्टि होता है; यही नारायण का चक्र स्वरूप है। विष्णुनाभि से नि:सृत लक्ष-लक्ष, कोटि-कोटि जीवात्माएं सृष्टि में आ रही है एवं काले गह्वर में पतित होकर विनष्ट हो रही है। विष्णुनाभि का यही नित्यरूप है। विष्णुनाभि से चेतना को पीछे करने पर जबाफूल सदृश चक्र पंचदलरूपी 'आद्याशक्ति श्रीश्रीमाँ' के चरण दर्शित होते है। यही रुद्रग्रंथि है। रुद्रग्रंथि कैसे भेद होती है उसके विषय में मैं बाद में विवेचना करूगीं। *...क्रमश:*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

योग व्याख्या श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

(२१)

प्रश्न : ''राधा'' कौन हैं?

उत्तर : चैतन्य धारा का निवृत्त रूप ही हुआ ''राधा''। जैसे ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण प्रकृति से अतीत उसी प्रकार ''राधा'' ब्रह्मस्वरूपा निर्लिप्त और प्रकृति के परस्थिता जैसे कार्य हेतु कालवश भगवान सगुण स्वरूप धारण करते हैं, उसी प्रकार कर्म द्वारा काल वश राधा त्रिगुणात्मिका प्रकृति स्वरूपा बन जाती हैं। वही परमेश्वर प्राण रसना, बुद्धि और मन की प्रकृति के संग संयोग बल से संबंध रखते हैं। काल के अनुरूप ही उनका आविर्भाव या तिरोभाव होता है। भगवान की तरह वे भी अकृत्रिमा नित्या एवं सत्तस्वरूपा कहकर ''भगवती'' नाम से जानी जाती हैं। प्राण की अधिष्ठात्री देवी को ही ''राधा'' कहते हैं। रसना की अधिष्ठात्री देवी हुई सरस्वती; दुर्गति नाशिनी दुर्गा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, वे ही हिमालय कन्या ''पार्वती'' हुई। वे समस्त देवगणों के तेज में अवस्थित हैं। सकल दैत्यगणों की संहार कारिणी एवं देवताओं की शत्रु विनाशिनी। वे ही समस्त देवताओं की स्थान प्रदायिनी हैं। वे जगद्धात्री रूप से त्रिजगत् की धातृरूपा, क्षुधा-पिपासा, दया, निद्रा, तुष्टि, पुष्टि व क्षमारूपा। वे लज्जा और भ्रान्तिस्वरूपा एवं सबों की अधि-देवी, मन की अधिष्ठात्री देवी एवं ब्राह्मणों की सावित्री है। वे राधा के वामांश सम्भूता महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। महालक्ष्मी देवी वैकुण्ठाधिपति भगवान की पत्नि एवं वे ही निरामय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा-पत्नि के रूप में ''सावित्री'' नाम से जानी जाती हैं। पूर्व काल में वृंदावन के रास की अधिष्ठात्री परिपूर्णतमा ''देवी सती'' स्वयं रास की ईश्वरी हुई। वे रासमण्डल में रास क्रीड़ा करती हैं एवं ''राधिका'' नाम ग्रहण कर परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण के समीप नित्यारूप से अवस्थान करती है। जैसे दुग्ध एवं दुग्धाधार स्तन, आधार आधेय भावयुक्त, कृष्ण एवं राधा का संबंध भी तद्रूप। योगमाया परिचालित लीला निमित्त कृष्ण हुए पुरुषोत्तम परम एवं राधा हुई परमा प्रकृति। कृष्णांग से ही राधा समुद्भूत हुई हैं। एवं ''राधा'' से ही अन्यान्य देवियों का उद्भव संभव हुआ है। प्रणवाद्या महामाया राधा की महिमा अनंत, वाक्य द्वारा इन्हें व्यक्त करना संभव नहीं है।

(२२)

प्रश्न : 'ॐ गणानांत्वा गणपतिं हवामहे, प्रियनांत्वा प्रियपतिं हवामहे। निधिनांत्वा निधिपतिं हवामहे, वसोमम्।।' – इस मंत्र का क्या अर्थ है?

उत्तर : यह यजुर्वेदोक्त मंत्र है। इस मंत्र का शब्दार्थ हुआ – (गणानाम्) अर्थात् गण-गणों के मध्य तुमको (त्वा) गणपति का (गणपतिम्) आवाहन करता हूँ (हवामहे)। प्रियगणों के मध्य तुमको अर्थात् प्रियपति का आवाहन करता हूँ।

(निधिनाम्) अर्थात्, निधिगणों के मध्य तुमको, निधिपति का (निधिपतिम्) आवाहन करता हूँ। हे वसुरूप परमेश्वर, आप हमारे पालक हैं। (वसो मम्)।

युगावतार परम पुरूष श्रीश्री रामकृष्ण

धर्म संस्थापनार्थ एवं जीवों के उद्धार के लिए ही युगों-युगों में परम पुरूष अवतरित होते है। भारत में ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में अपना प्रभाव व प्रसार बढ़ाती हुई ईसाई मिशनरियाँ हिन्दू धर्म के मूर्ति पूजा के नाम पर हिन्दूओं के एक बहुत बड़े अंश को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रही थी। उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध में जब सनातन धर्म रूपी सूर्य पर ग्रहण की काली छाया स्पष्ट दिख रही थी उसी काल में १८३६ ई में फाल्गुन मास की शुक्ला द्वितीया को भारतवर्ष की पुण्यभूमि पर परमपुरूष श्रीश्रीरामकृष्ण का आविर्भाव हुआ। आत्मोपलब्धि के चरम मुहूर्त में उन्होंने स्वयं ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया तथा अपने आविर्भाव रहस्य से अवगत हुए। उन्होंने देखा गोपालरूपी एक दिव्य ज्योतिर्मय शिशु ने नित्यलोक से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता ऋषिमण्डल में से एक ध्यान मग्न ऋषि को प्रेम से गले लगाते हुए कहा,''मैं जा रहा हूँ तुम भी आओ'' उन गोपाल शिशु के दृष्टिपात के फलस्वरूप ही जिस ऋषि-शिशु का जन्म कलकत्ता के शिमलापाड़ा लेन में हुआ, वे ही परवर्तीकाल में श्रीश्रीरामकृष्ण के प्रधान शिष्य व लीला प्रकाश के उपयुक्त सहचर हुए स्वामी विवेकानन्द। उस महामानव ने जन्म लिया एक अज्ञात, अख्यात कामारपुकुर ग्राम के अतीव सत्यनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में। पिता श्री क्षुदिराम चट्टोपाध्याय जब गया में थे तभी उन्हें स्वप्न के माध्यम से पूर्वाभास हो गया था कि, स्वयं गदाधर उनके पुत्र रूप में आ रहे है। असाधारण परिस्थितियों के मध्य जन्में उस शिशु का नाम रखा गया 'गदाधर'। उन्हें सभी प्यार से 'गदाई' कहकर बुलाते थे।

बाल्यकाल से ही उनके मध्य असाधारण लक्षण परिलक्षित् होने लगे। पाठशाला जाकर उन्होंने सभी विषयों में दक्षता प्राप्त की लेकिन अंक-गणित के योग, वियोग में से वियोग करना कभी भी उस महापुरूष को समझ न आया। और समझ भी कैसे आता? जो सर्वदा योगयुक्त अवस्था में स्थित रहते थे, उन्हें कैसे कोई वियोग सीखा सकता था? किन्तु अन्यान्य सभी विषयों में वे पारंगत थे जैसे साहित्य, चित्रकला आदि तथा अभिनय में तो इतनी दक्षता थी कि कोई उनके समक्ष टिक न पाता था। धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत या नाटक के साथ किए गए कीर्तन को एकबार सुनते ही कंठस्थ कर लेते। आस पास के पड़ोसी उनके शैशव के अद्भूत बाल सुलभ अभिनय कीर्तन उनके मुखारबिन्द से सुनते।

एकबार एक नाट्य में शिव का अभिनय करने वाले पात्र की पेट की अवस्था खराब थी। उस अस्वस्थता की स्थिति में वे अभिनय न कर सके। अत: अंत में गदाई को ही शिव के सदृश सजाकर अभिनय करने के लिए मंच पर उतारा गया। लेकिन वे अभिनय क्या करेंगे? वे स्वयं ही शिव के आवेश में समाधिस्थ हो गये। उनके ध्यान को भंग करने के लिए सभी की इतनी प्रचेष्टा! लेकिन सब व्यर्थ। नाटक देखने आया जन समूह वास्तविक शिव को देखकर मुग्ध और विस्मित रह गया। इस घटना के पश्चात् देखा गया कि उन्हें किसी मन्दिर में ले जाने पर उनमें वहाँ अधिष्ठित देवता का आवेश स्फूरित होता। बगुले के समूह को नील आकाश में उड़ते हुए देख समाधिस्थ हो गये। तब उनकी उम्र थी ७-८ वर्ष की। वही उनकी प्रथम समाधि थी। १७-१८ वर्ष की उम्र में वे दक्षिणेश्वर पधारे। अपने बड़े भाई का हाथ थामकर, जिन्होंने भक्ति पूर्वक माँ भवतारिणी की पूजा का भार लिया था। वहाँ पर उनके माधुर्य को देखकर रानी रासमणि श्रद्धाभिभूत हो उठी। अति शीघ्र ही अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में उन्होंने श्यामामाँ की पूजा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। रानी रासमणि द्वारा प्रतिष्ठित माँ भवतारिणी के माध्यम से उनके ईश्वरीय भाव प्रकाशित होने लगे तथा रानी के जमाता श्रीमथुरनाथ विश्वास के सहयोग से उनकी दिव्य लीला परिपुष्ट होने लगी।

इसी समय वे जीवन-मरण की चिन्ता को छोड़कर मातृसाधना में मग्न हो गये। गंगा के तट पर लेटकर वहाँ की

रेत पर मुख को रगड़-रगड़कर रोते और कहते, ''एक दिन और चला गया, प्रकट हो माँ, प्रकट हो।'' इसी भाव में हृदय की अति व्यथा से उनके मुख से रक्तस्राव बहने लगता। तथापि उनका वह करुण क्रंदन थमता नहीं! ''दर्शन दो, दर्शन दो माँ! दिखाई नहीं दोगी तो? तुम्हारे हाथ की खड्ग से ही यह जीवन लीला शेष कर दूँगा!'' एकदिन खड्ग लेकर जैसे ही उद्यत हुए अपनी इहलीला समाप्त करने के लिए, उसी क्षण उन्होंने ज्योतिर्मयी माँ के दिव्यरूप का दर्शन प्राप्त किया। इसी प्रकार उन्होंने उस पाषाण प्रतिमा माँ भवतारिणी को जाग्रत किया। तत्पश्चात् अक्सर माँ और पुत्र एकाकार हो जाते। किसकी पूजा कौन कर रहा है यह समझना बहुत ही मुश्किल था। उनके इस दिव्य भाव की अवस्था बहुत से लोग समझ नहीं पाते थे। वे सोचते कि उन्हें उन्माद हो गया है। तब आत्मीयजनों ने परामर्श कर उनके विवाह की सलाह दी। इस पर स्मित हास्य बिखेरते हुए स्वयं ही अपनी योग्य सहधर्मिणी का पता बता दिया कि वह किस घर में है। स्वनिर्वाचित पात्री के साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ। पाँच वर्ष की वधु और २४ वर्ष का वर। परम यत्न पूर्वक उन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार किया। लेकिन इसके बाद भी उनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। आजीवन उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह किया। महामानव श्रीरामकृष्ण श्रीश्री सारदामाँ को सांसारिक कार्य और उसके साथ त्याग वैराग्य के आदर्श की शिक्षा देते। परवर्ती समय में साधना की भी शिक्षा दी। श्रीश्रीरामकृष्णदेव 'श्रीश्रीठाकुर' नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे। उनका चलना-फिरना, बातचीत अति साधारण लोगों के तरह ही थे, जैसे भोला-भाला, व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जिनका उपनाम था नरेन, उन्हें वे 'लॉरेन' कहकर पुकारते। ठीक प्रकार से जैसे उच्चारण ही न आता हो। सबके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार में वे अद्वितीय थे। वे निर्जन में जाकर रोते और कहते ''माँ, मेरी त्यागी सन्तानों को कब लेकर आओगी? मैं विषयी लोगों के बीच नहीं रह सकता। मेरे प्राण त्यागी सन्तानों के लिए वैसे ही छटपटाते है जैसे गमछे से कोई जल निचोड़ता है। इस करुण क्रंदन के पश्चात् एक-एक करके त्यागी सन्तानें उनके पास आने लगी।

उन लोगों ने भी उनको (श्रीश्री ठाकुर को) कम नहीं परखा था! एकबार उन्होंने नरेन के साथ एक महीने तक बातचीत नहीं की। फिर भी वे श्रीश्री ठाकुर के पास पैदल चल कर आते कलकत्ता से दक्षिणेश्वर तक। श्रीश्रीठाकुर ने एकबार उनसे कहा, ''मैं तो तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा, फिर भी तुम यहाँ क्यों आते हो?''

नरेन ने कहा, ''आपको अच्छा लगता है इसीलिए आता हूँ।'' स्मित हास्य लिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य नरेन को अपने अंक में भर लिया। कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए भविष्य के स्वामी विवेकानंद।

प्रचार विमुख निरभिमानी श्रीश्री ठाकुर को स्वयं को छिपाकर रखना अच्छा लगता था। उन्होंने सिर्फ दक्षिणेश्वर में बैठे-बैठे ही हिन्दुमत की समस्त साधना एवं इस्लाम धर्म की साधना कर सिद्धिलाभ प्राप्त की थी। ईसा मसीह का भी उन्होंने दर्शन किया, तथा वे श्रीश्रीठाकुर की काया से मिलकर एकाकार हो गये। स्वयं साधना कर उसके बाद उन्होंने ये महावाक्य व्यक्त किए – ''जितने मत उतने पथ'' समस्त धर्म सत्य है। सब धर्म एक-एक पथ कहकर मान्य है उस महान लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। उन्होंने सहज, सरल सामान्य लोक प्रचलित बातों द्वारा जगत् के श्रेष्ठ आध्यात्मिक सम्पद वेद, उपनिषद और गीता की गभीर उपलब्धि और तत्त्वकथा को इस प्रकार समझाया कि जिससे वे साधारण लोगों को बोधगम्य हो सके। इसीलिए यह देखा जाता है कि तत्कालीन समाज के जो पण्डित, साहित्यिक और गुणी लोग उनके दर्शन करने आते मुग्ध और विस्मित हो उनके चरणों में नत-मस्तक हो जाते।

नरलीला के अन्तिम चरण में श्रीश्रीठाकुर जब जगत् का भार लेकर दुसाध्य रोग कैंसर को भोग-भोग कर अति दुर्बल हो गये थे तब भी नरेन के मन में क्षुद्र सन्देह था कि ''इस अस्थिचर्ममय देह को, लोग भगवान कहकर मानते है। यदि वे स्वयं अपने मुख से कहें कि वे भगवान है तभी विश्वास करूँगा।'' तत्क्षण श्रीश्रीठाकुर बोल उठे, ''अब भी अविश्वास? जो राम, वही कृष्ण, इस देह में रामकृष्ण दोनों ही है, पर तेरे वेदान्त मत से नहीं।'' आखिरकार नरेन अश्रुसिक्त चक्षुओं से उनके युगल-चरण में गिर पड़े।

परवर्तीकाल में स्वामी विवेकानंद ने विश्वधर्म सम्मेलन सभा में उनके इसी आदर्श का प्रचार कर विश्व में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब प्राप्त किया था। तभी से भारतीय धर्म के प्रति सम्पूर्ण विश्व का दृष्टिकोण ही बदल गया। भारतीय आध्यात्मिक सम्पदा के अनुसंधान के लिए आज भी पाश्चात्य जगत् तत्पर है। स्वामीजी के पाश्चात्य अनुरागी

व्यक्ति ने उनसे उनके गुरु के संबंध में कुछ सुनने की इच्छा जाहिर की। तब स्वामीजी ने उनसे कहा, ''मेरे गुरु को समझने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, सिर्फ एक बात ही उनके संबंध में कह सकता हूँ, वे थे L-O-V-E Personified अत: उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम स्रोत में ''अवतार वरिष्ठ'' कहकर प्रणाम निवेदन किया है। हम लोग उनके संबंध में क्या बोल सकते है। उनके विषय में कुछ बोलना और समुद्र के जल की अथाह गभीरता को मापना एक ही बात है। हम लोग इस महामानव को अपने अन्तरतल से सश्रद्ध प्रणाम करते है उनके ही अन्यतम शिष्य स्वामी अभेदानंद की भाषा में – जननीं सारदां देवीम् रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो नित्यं प्रणमामि मुहुर्मूहु।

श्रीश्रीठाकुर ने अपने निर्दिष्ट जिस कन्या से विवाह किया था, उनकी महिमा को किसी भी क्षेत्र में कम आंकना अनुचित है। नहीं तो क्या श्रीश्रीठाकुर उनकी सोलह वर्ष की उम्र में फलहारिणी कालीपूजा की रात्रि में अति गोपनीयता से षोड़शी भुवनेश्वरी रूप में पूजा करते? पूजा करके उन्होंने अपनी समस्त साधना का फल, यहाँ तक कि जप की माला पर्यन्त श्रीश्रीमाँ के चरणों में समर्पित कर दी। श्रीश्रीमाँ ही थी उस पूजा को ग्रहण करने की योग्य अधिकारिणी – उनके त्याग, तितिक्षा सावित्री और राधा को भी अतिक्रम कर चुके थे। अपने धर्मसंस्थापनार्थ कार्य के लिए श्रीश्रीठाकुर ने मुष्टिमेय जनों का चुनाव कर उन्हें दीक्षा दी। और करुणामयी श्रीश्रीमाँ ने बिना किसी भेदभाव के समस्त संतानों का भार वहन किया, ऊँच-नीच, धनी-दरिद्र, पापी-तापी निर्विशेष।

हम लोगों का यह परम सौभाग्य रहा कि, मेरे पिताजी श्रीश्रीमाँ से दीक्षा प्राप्त कर उनके कृपाधन्य हुए, जिसके फलस्वरूप ही आज भी हम लोगों ने उस दुर्लभ निधि को पाया है। श्रीश्रीठाकुर और श्रीश्रीमाँ के प्रति ऐसा उत्कट समर्पण था उनमें, जिसे हमने प्रत्यक्ष किया है! मेरे आठ वर्ष के भाई का जब बिना चिकित्सा के देहांत हो गया, तब उन्होंने उस तीव्र शोकावेग को कम करने के लिए मेरी माँ को सांत्वना देकर कहा, 'रोओ मत तुम, मेरे ठाकुर ने उसे अपने हृदय में संजोकर रखा है।' मेरे पिताजी श्रीश्रीठाकुर का एक फोटो अपने सिरहाने के पास रखते थे। मेरे नास्तिक मामा सब मेरे पिताजी को क्रोधित करने के लिए कहते, ''जामाईबाबू इस फोटो से ऐसा क्या लगाव है कि, इस बुड्ढेकी छवि को इतने यत्न से रखा है, जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकर्षण!'' प्रत्युत्तर में मेरे पिता उनसे हँसते हुए कहते, ''मैंने तो इस चराचर जगत् में उनके सदृश सुन्दरता किसी में नहीं देखी है।'' मेरे पिता के कारण ही जब हम निवेदिता विद्यालय में पढ़ते, तब प्राय: ही उद्बोधन या श्रीश्रीमाँ के गृह में जाते वहाँ सब वयोवृद्ध साधुओं के स्नेह और सान्निध्य में कुछ समय अतिवाहित करते। उनकी छत्रछाया में ही मैंने किशोरावस्था प्राप्त की। वे लोग समस्त सद्ग्रन्थों का पाठ कराने के लिए बहुत श्रम करते उनके ही अनुग्रह से मैंने किशोरावस्था में तत्कालीन प्रेसिडेन्ट महाराज पूज्यपाद स्वामी विरजानन्द से दीक्षाप्राप्त की।

मैंने अपने जीवन के संकटपूर्ण मुहूर्त में श्रीश्रीमाँ और श्रीश्रीठाकुर की कृपा उपलब्धि की है। उनके कृपा और करुणा के विषय में जितना भी बोला जाय उतना ही कम होगा। मेरे आठ वर्षीय पुत्र को देवघर विद्यापीठ में भर्ती करने के समय मेरा मन दुविधाग्रस्त था, उस समय स्वप्न में श्रीश्रीठाकुर के दर्शन और निर्देश पाकर मैं कृत-कृत हो गयी। उसी के परिणाम स्वरूप रामकृष्ण मिशन 'देवघर विद्यापीठ' से मेरे दोनों पुत्रों ने विद्यार्जन किया।

युग युग में श्रीश्रीठाकुर और श्रीश्रीमाँ भिन्न-भिन्न रूपों में अवतीर्ण होते है, इसे प्रत्यक्ष किया, 'श्रीश्री चण्डीदास' लिखने के समय। जब मैं सद्गुरु रूपी श्रीश्रीमाँ के आदेश पर किताब लिखने बैठी तो अत्यंत चिन्तित हो पड़ी कि ठीक से लिख सकूँगी तो? श्रीश्रीमाँ ने तब कहा, ''वीणादि, तुम्हारे श्रीश्रीठाकुर ही हुए हैं श्रीश्रीचण्डीठाकुर वे स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देंगे।'' सचमुच ही एकदिन परम करुणामय श्रीश्रीठाकुर ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। तब उस पुस्तक को लिखकर मुझे परम तृप्ति का अनुभव हुआ एवं जिन्होंने भी उस ग्रंथ को पढ़ा है उन्होंने भी परम आनन्द की प्राप्ति की है।

श्रीश्री चण्डीदास और रामी या रासमणि का आविर्भाव एक ही प्रकार से एक काल के सन्धिक्षण में हुआ है, उस समय मुसलमान शासकों के अत्याचार से भारत का सनातन धर्म और जातीय जीवन जर्जरित हो रहा था वे घोर दुर्दिन थे। उसी समय उन्होंने आकर सत्य घर्म का प्रचार कर देश और घर्म को विजातिकरण करने वाले हाथों से बचाया संगीत के माध्यम से। उनकी वाणी, ''सभी के ऊपर मनुष्य सत्य।''

–मातृचरणाश्रिता श्रीमती वीणा चौधुरी

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

ऐतरेयोपनिषद्

(ऋग्वेद से संक्षेप में सारभूत)

प्रथम अध्याय

प्रथम खंड

नामरूप और कर्म आदि के भेदों के कारण यह जगत् भिन्न भिन्न प्रकार के आकारों से सजा हुआ है किन्तु इनकी उत्पत्ति से पहले सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, भूख-प्यास आदि सभी सांसारिक धर्मों से रहित, नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुक्त स्वभावसम्पन्न, जन्म-जरा-मृत्यु से रहित अदृश्यरूप एकमात्र आत्मा ही था।

(सांख्य व अन्य कुछ मतों के विपरीत) वेदान्त सिद्धान्त में आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं मानी गयी है, एक मात्र आत्मा ही था।

'सर्वज्ञ' स्वभाव होने के कारण 'एकाकी' उस आत्मा ने चिंतन किया, ''मैं प्राणियों को, कर्मों के कर्मफल उपभोग के योग्य स्थान / लोकों की रचना करूँ। इस अभिप्राय से ईक्षण किया।

स इमालँल्लोकानसृजत (१/१/२)

(प्रथम अध्याय/प्रथम खण्ड/ श्लोक २)

बिना किसी उपादान के यह कैसे संभव हुआ?

जिस प्रकार जल में बुलबुलें उठते है, उस ईश्वर तत्त्व ने स्वयं को उपादान के रूप में व्यक्त किया।

यह जगत् वास्तव में 'ईशावास्य (ईशावास्य उपनिषद से उद्धृत्) इदं सर्वम् यत्किंचित जगत्याम् जगत्' एक विराट् जलराशी के समान यह असीम ईश्वर है व दृश्य जगत् उसमें फेन के समान दृष्यमान है। अथवा जिस प्रकार बुद्धिमान मायावी 'उपादान' कारण न रहने पर भी स्वयं अपने को ही आकाश में चलता हुआ सा बना लेता है।

उस ईश्वर ने विभिन्न लोकों, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि जैसे पंचभूतों को उत्पन्न करके विशाल सृष्टि को गोचर किया। कर्मफलों के भोगादि के लिये चार लोकों व लोकपालों की रचना एवं विभिन्न जीवों की रचना पंचभूतों के माध्यम से की। उन्हीं पंचभूतों के माध्यम से सिर, हाथ, पाँव आदि वाले पुरुष आकार को योजना कर सृष्टि को बढ़ाया। ईश्वर के संकल्परूप तप से अभितप्त हुए उस पिण्ड में मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गये जैसे पक्षी का अण्डा फूट जाता है।

इसी प्रकार से वाक् इन्द्रिय - उसका अधिष्ठाता अग्नि, नासिका व उसका अधिष्ठाता प्राण व वायु, दो नेत्र, दो कान और त्वचा, हृदय और मन (अंतःकरण) हुए। सम्पूर्ण प्राणों का बंधन स्थान नाभि, अपान वायु से युक्त गुहा उसका देवता मृत्यु उपन्न हुआ। प्रजनन इन्द्रिय का गोलक शिश्न व 'रेतः', रेतः से 'आप' यानि जलस्वरूप 'वीर्य' का प्रादुर्भाव हुआ।

द्वितीय खण्ड

''ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्महव्यर्णवे प्रापतन्''

(१/२/१)

इस प्रकार से लोकपाल रूप, वे रचे गये इन्द्रियाभिमानी देवगण (अविद्या, काम और कर्म रूप वाले) जल से परिपूर्ण संसार रूप महासमुद्र में गिर गये। उस पिण्डों को परमेश्वर ने क्षुधा पिपासा से अभिभूत कर दिया; तब उन्होंने ईश्वर से भोज्य वस्तु 'अन्न' व उसके भक्षण योग्य 'स्थान' (उपयुक्त शरीर) की याचना की।

ईश्वर द्वारा प्रस्तुत किये गये, 'गौ रूप' व 'घोड़ा रूप' आदि से देवता संतुष्ट न होने पर ईश्वर ने योनि स्वरूप पुरुष पिंड को प्रस्तुत किया जिससे देवतागण प्रसन्न होकर उनमें प्रवेश कर गये।

''ताभ्यः पुरुषम् आनयता अब्रुवन् सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतं ना अब्रवीत् यथायतनं प्रविशत् इति।''

-(१/२/३-४)

उन्होंने उनके अपने लिये लाये गये पुरुष शरीर की सुंदरता को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की; निश्चय ही पुरुष शरीर एक सुन्दर रचना है। उन देवताओं से परमेश्वर ने कहा कि इस शरीर के अपने अपने आश्रय स्थानों में तुम प्रवेश कर जाओ।

- –वागीन्द्रिय के अभिमानी देव अग्नि ने वाणी होकर मुख में प्रवेश किया।
- –वायु ने प्राण होकर नासिका छिद्र में प्रवेश किया।
- –सूर्य ने चक्षु होकर नेत्रों में प्रवेश किया।
- –दिशाएँ श्रोत्रेन्द्रिय होकर कानों में प्रविष्ट हुई।
- –औषधि और वनस्पतियाँ लोम होकर त्वचा में प्रविष्ट हुईं।
- –चन्द्रमा मन होकर हृदय में प्रविष्ट हुआ।

–मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हुई।
–जल वीर्य होकर शिश्न इन्द्रिय में प्रविष्ट हुआ।
क्षुधा–पिपासा को भी ईश्वर ने देवताओं का भागीदार बना दिया। अत: जिस किसी देवता को भी आहुति दी जाती है, उसमें यह भूख–प्यास भी भागीदार रहते है।

संकलन – मातृचरणाश्रित श्री सी.पी. सिंघल

आश्रम समाचार

३ जनवरी – इस दिन सायंकाल में आश्रम मंदिर में एक मनोमुग्धकारी नृत्यानुष्ठान का परिवेशन मोहिनीआट्टम नृत्य गुरु श्रीमति मोम गांगुली एवं उनकी सह–शिल्पीवृंद ने किया।

१३–१४ जनवरी – श्रीश्री गुरुमहाराजाओं के आसन प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य पर अखण्ड महापीठ आश्रम में सप्तम् वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। १३ जनवरी को होटोर आश्रम के सभी छात्राओं को श्रीश्रीमाँ द्वारा प्रदत्त उपहारों प्रदान किया गया। सायंकाल के सांस्कृतिक अनुष्ठान में शिशु शिल्पी श्रद्धादासगुप्त के नृत्य प्रदर्शन के उपरांत, होटोर के शिशु एवं बालिकाओं ने एक मनोरम नृत्य–गीतानुष्ठान प्रस्तुत किया। १४ जनवरी को श्रीश्रीमाँ ने ब्रह्मचारिणी उमा (साध्वी प्रभानंदमयी) और श्रीमती बासन्ती (साध्वी धीरानंदमयी) को पूर्ण सन्यास की दीक्षा प्रदान किया। तदुपरांत श्रीश्री गुरुमहाराजाओं की पूजा एवं यज्ञानुष्ठान संपन्न हुई। सायंकाल के अनुष्ठान के प्रारंभ में ही हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्त्ती संख्या एवं डा. पार्थ प्रतिम चक्रवर्त्ती विरचित 'महावतार बाबाजी महाराज' नामक अंग्रेजी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। तत्पश्चात् शिशु शिल्पी अशोका बोस एवं पंडित श्री गिरिधारी नायक के 'ओडिसी आश्रम' के शिष्यवृंदो द्वारा नृत्यानुष्ठान का परिवेशन हुआ। हमसबों के गुरूभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों के अथक परिश्रम से सभी आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। इन दोनों दिन अनेक भक्तवृंदों ने अत्यंत परितृप्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। शिवरामपुर स्थित शिशु विद्यालय (ऐक्यतान) के सभी शिशुगण भी आमंत्रित थे।

४ फरवरी – इस दिन श्रीश्रीमाँ कई आश्रमवासियों के साथ परिदर्शन हेतु होटोर आश्रम गयीं। वहाँ साध्वी सुचेतानंदमयी एवं साध्वी पूर्णानंदमयी ने आरती एवं पूजा के द्वारा श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदित किया। आश्रम के ब्रह्मचारिणी एवं शिष्याओं ने भी एक–एक कर श्रीश्रीमाँ को श्रद्धानिवेदित किया। तदुपरांत आश्रम के विद्यार्थियों ने एक सुन्दर सांस्कृतिक अनुष्ठान का परिवेशन किया।

१५ फरवरी – श्रीश्रीगोविन्ददास उदासी बाबा के १०५वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर श्रीश्रीमाँ ने श्रीश्रीराधामाधव के अन्न भोगादि प्रसाद के साथ स्वामी सदाशिवानंदजी एवं गुरुभगिनि श्रीमती शुभ्रा चटर्जी को मनोहर पुकुर अवस्थित 'बंग–उदासी मठ' में भेजा।

१७ फरवरी – शिवरात्रि की संध्या में कुछ गुरुभ्राता एवं गुरुभगिनियों के साथ श्रीश्रीमाँ ने मंदिर, में कुछ अपूर्व भजन गाये। तत्पश्चात् श्रीश्रीमाँ ने अकेले स्वकरों से शिवपूजा की मध्यरात्रि में यज्ञ–भवन में यज्ञनारायणदा ने शिवरात्रि का यज्ञकार्य संपन्न किया।

५ मार्च – दोल पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में दोपहर में श्रीश्रीराधामाधव को भोग निवेदित किया गया। सायंकाल में श्रुतिमधुर भजनानुष्ठान एवं पंडित गिरिधारी नायक के शिक्षावृंदों द्वारा परिवेशित ओडिसी नृत्यानुष्ठान के माध्यम से दोल पूर्णिमा तिथि मनायी गयी।

१३–१५ मार्च – श्रीश्रीमाँ कई गुरुभ्राता एवं गुरुभगिनियों के साथ परिदर्शन हेतु पुरी आश्रम गयी। वहाँ अवस्थान काल में श्रीश्रीमाँ ने ५० से अधिक दरिद्रनारायण के सेवा की व्यवस्था की। 'डिवाइन लाईफ सोसायटी' (बालिगोयालि) के महंत श्री जितमहानंद जी ने श्रीश्रीमाँ के साथ साक्षात्कार किया एवं कुछ समय सत्संग में अतिवाहित किया। लौटते समय श्रीश्रीमाँ ने रेमुना अवस्थित 'खीरचोर गोपीनाथ' का दर्शन किया।

२२ मार्च – आध्यात्मिक सभा के पंद्रहवे पर्व पर 'उपनिषद प्रसंग' के द्वितीय पर्याय का व्यख्यान का परिवेशन श्रीश्रीमाँ के संतान पार्थ प्रतिम चक्रवर्त्ती (निर्दशक, आई.आई.टी खड्गपुर) ने किया।

२७ मार्च – नवरात्रि की अष्टमी तिथि के प्रात:काल में श्रीश्रीअन्नपूर्णा माँ की पूजा अन्नपूर्णा मंदिर में संपन्न हुई। पूजा के पश्चात् उपस्थित सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सायंकाल में मंदिर में भक्तिगीति के अनुष्ठान का आयोजन हुआ।

२७ मार्च – इस दिन सायंकाल आश्रम मंदिर में राम–नवमी के अवसर पर एक सुन्दर भजनानुष्ठान सम्पन्न हुआ।

Glimpses of Sri Ramakrishna Leela-Tattwa

Crossing the busy road, a teenager slowly walked up the stairs of the colonial mansion on old Kolkata's famous Bowbazar Street, a building that bears testimony to quite a bit of history, (spiritual as well as of relevance to the freedom movement) and reached the top floor. He entered Sri Mandir and bowed down before a saintly man partially lying on his bed on the floor, his head resting on the wall. It seemed to be a combination of his bedroom, puja room as well as audience room. There were enthroned deities to be worshipped in various places. The walls were covered with photographs of Sri Krishna and Sri Ramakrishna. Few also seemed from the saint's own life. The atmosphere was serene and spiritually very uplifting.

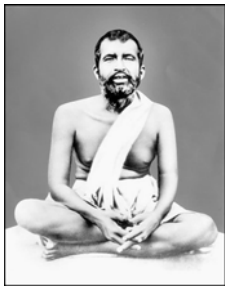

'What brings you here?' he asked after blessing the young lad. 'I want to write something about Sri Ramakrishna and I am told that you have seen his leela', he replied.'But you are presently under the shelter of the divine mother, Sree SreeMaa, and she knows it better than anyone else. Why do you not ask her instead of me?' the saint queried. 'Nowadays she becomes very emotional if I bring up his reference,' the boy responded. The saint smiled and pointed his finger at the one side of the wall where there were four pictures, each in a beautiful golden frame. The first two were pictures of worship being performed by Sri Ramakrishna - one of Maa Bhavatarini, the presiding deity of Dakshineshwar and the other where he was sitting and placing flowers at the feet of a demure Maa Saradamoni, sitting shyly with her head covered by her sari (in a 'ghomta' as we call it in Bengal). Above them was written 'Sadhan Leela'. The boy had seen only paintings and sketches of these pictures. But these seemed to be real coloured photographs on a shining LCD-like screen. The subsequent two pictures were well-known to him as they were among the very few photographs taken in Sri Ramakrishna's lifetime. One of them was of Sri Ramakrishna standing with one hand held up in the air and the other on his chest. The other was the famous photograph of his sitting on the floor in a meditative mood. Maa Sarada's picture was also beside Sri Ramakrishna in the second photo. Above these two were written 'Tattwa Leela'. These also appeared to be coloured photographs on a shining screen. They looked absolutely real and were not black and white photographs touched up in colour by some artist.

The young man approached the 'Sadhan Leela' set in guarded wonder. The first one was of Sri Ramakrishna worshipping Maa Bhavatarini. Just below it on the frame was written 'Paramshiva'. As he began to gaze at the remarkable photograph, from behind the saint whispered, 'Touch it'. He touched the screen of the photo. A movie began playing. While the picture was being played on the screen, the sound was heard internally – from within him. Initially a stotra reverberated:

Om Deva Deva Mahadeva,
Deva Panchanan Hari;
Poojitam DasaMahavidya,
Durga Divya Parameshwari.
[*Thou art Mahadeva, Lord of the Lords,*
Manifesting the three supreme Gods;
Worshipping the Mother universally present,
Invoking her supramental divine descent.]

Then a scene set in motion with Sri Ramakrishna standing in front of the temple of Maa Bhavatarini. Entering the temple, Sri Ramakrishna closed the door and started talking to Maa Bhavatarini – "Tell me Maa, all those who come to you, they are also your children. But the way you talk to me, reply to my queries, you do not do the same with them. You do not appear before them. Why? For this, people will blame you. In front of them you become a mere clay idol and with me you become alive. What sort of justice is this?"

Maa Bhavatarini replied – "I talk to them and also appear before them, but they can neither see me nor hear me. They are 'kala' (deaf) and thus cannot see Kali. Just like a child fully engrossed in watching a picture cannot even see or hear someone else around, so are they–so engaged in their desires and cravings that they are unable to hear me. When their ears will open like yours, they will be able to

hear me like you. Therefore, as of now, through you, I will show them that I talk to all and appear before everyone. Your devoted ones will believe you and be blessed by me."

Sri Ramakrishna then opened the door and saw a young Rakhal Maharaj standing there. Seeing Rakhal Sri Ramakrishna asked, "Can you please go out and beg for some rice and dal for me? I need to make food for the mother and have the prasad. Unless it is offered in a proper manner, neither will I be able to see how she accepts the offering nor will I get something to eat."

Hearing this, a surprised Rakhal replied, "Is there some special manner by which the mother accepts the offerings? You say that she comes fully adorned and receives the food that is offered. I assumed that like she talks to you, she also eats with you."

Sri Ramakrishna – "Does the mother really eat anything? To please her devotees, she appears to consume. Sometimes she merely smells it, sometimes she touches it, some she only glances at, and sometimes she merely turns her back and walks away. From her fingers rays of light emanate as deities or Gods and Goddesses who scan it with their radiation and their emotions or bhavas flash depending on the bhava of the person who has made the offering. Only when I personally cook or cut the fruits and offer it, she herself touches it. Even grand and expensive offerings made by others are not personally touched by her – she sends it to someone else to be the recipient – from a yogi to a charlatan, depending on her wish. Only when with a lot of difficulty I am able to make proper kheer using pure cow's milk, she herself comes and puts her big toe in it and thousands of Gods and Goddesses appear to receive the prasad on that occasion."

Breaking his silence Rakhal asked, "Were these Devas and Devis created from the mother's toe?"

Sri Ramakrishna replied, "What else! The universal mother is one, did you not know that? From within her all nature and beings emanate as her children. From her, infinite worlds are created. She appears as the sum total millions of her created entities, yet she is both them and separate. Have you not seen a cabbage? The whole cabbage appears to be covered by leaves. The mother is also like that. The leaves in the outer appear dark and dull while the inner leaves are radiant and dazzling. When you dive very deep you will reach the realms of her nectar filled ocean. From the middle of the ocean, the droplet of amrita rasa that appears is her pristine appearance. Like a child cannot take anything other than mother's milk, likewise She takes nothing other than pure bhava. That is her only food. Did you get it?"

The movie stopped and the young man stood still in blessed bewilderment.

He then stepped to the right to move to the next photograph which depicted Sri Ramakrishna placing flowers at Maa Saradamoni's feet. Below on the frame was written 'Kesava'. Slowly raising his right hand, with a slight tremble, he touched the screen. Again a movie began. First a wonderful stotra:

Om Adi Deva, prithivimoolam,
Tri-shakti dhritaKesavam;
Jiva-Shiva-Nara madhyam,
Jivantam Radha-ballavam.

[*In thee shines the supreme – origin and cause,*
The light of Kesava, holding three power laws;
In a human form as both devotee and Godhead,
O living Rama-Krishna, Sree Radha's beloved.]

Then the movie began.

Maa Saradamoni – "I really cannot understand what you are doing. I am younger than you and after all you are my husband. For a woman like me, my husband is my only worldly Guru. Now if that person starts placing flowers at my feet, what will other people say? And to tell you the truth, when you touch my feet, I become numb and still, I am unable to speak and my whole body becomes ice-cold. Then someone enters me. I think it is your divine mother Bhavatarini, who completely mingles in me. I feel very scared. Please stop worshipping me. I will become a sinner."

Sri Ramakrishna (with a slight smile) – "You yourself say that the divine mother mingles in you, therefore you should understand that I am worshipping the living Bhavatarini. You are Radharani as Adyashakti, the supreme divine mother."

Maa Saradamoni – "I cannot apprehend anything at all. If I am the divine mother then why have I come as your wife? Why can I not realize that I am She? Your AdyaMaa talks to you as her child so

tenderly – I am not like that. You are able to explain everything so easily by talking to your mother, but I cannot. Your mother talks to you but not with me. One cannot become a divine Goddess just like that." Saying this Sri Maa's eyes swelled with tears and she fell at the feet of Sri Ramakrishna, deep in emotion.

Sri Ramakrishna (eyes full of water) – "This is how Maa performs her leela. Sometimes she dresses as a wife, sometimes as a husband. When she mingles within you, you are then Adya Maa. Again when she hides herself from everyone, you become a faithful wife. I worship you as Bhavatarini and at that time you cannot stop me from the worship. The difference between you and me is that I see only the divine mother everywhere but you have to do the work both as the divine mother as well as descend down and behave as an ordinary person. You are the mother of the Jiva as well as Shiva. Dehi taba Pada pallavamudaram."

Both of them went into Samadhi on the floor, liquefied into rasa and mingled into each other. The movie stopped. The teenager remained stupefied.

'Move on', said the voice behind him, 'Your scheduled time is passing. Now you will get only two more short glimpses'. So he quickly moved to the second set of pictures, namely the 'Tattwa Leela' set. The first one was of Sri Ramakrishna standing with his right hand held above in the air and his left hand across his chest. On the frame below was written 'Jagat Guru'. As he pressed the screen the tune of a wonderful stotra filled his whole being:

Om ekahastam shunyavritam,
Samagram Swaraga Golakam,
Abaksham martya Golakam,
Jagat uddharak Vishwa Palakam.

[*One hand raised up towards the limitless skyline,*
Across the heavens to the realms of pure divine;
The other on the heart where the earthly
Golaka lies,
Thou art the connector-liberator, Lord in
human guise.]

As the meaning unfolded he remained in emotive bliss. No movie followed. The saint was asking him to move ahead.

The next photo was the well-known set of Sri Ramakrishna and Maa Sarada, both sitting in meditative mood, cross-legged. Below them on the frame was written 'Yugavatar'. He touched it gently and the stotra began:

Om Ram parang Krishna parang
ShyamparangJagathite,
Om Hari Parang
Aloukika Narayana Namastute;

Om Veda Parang Srishti Parang
Purna Brahma Sanatani,
Sita Srimati Parang
Namastubhyang Narayani.

[*From beyond the physical forms of Rama, Krishna, Shyama and Hari for the sake of the world, lies the light of the eternal transcendental Narayana or Nitya Krishna. To him I offer my worshipping pranams. From beyond the Vedas and creations, physical forms of Sita and Srimati lies the primordial, eternal, supreme power, the transcendental Narayani or Nitya Radha. To her I offer my devoted pranams.*]

From behind the boy, the saint whispered in his mind: 'The radiating rays of the soul are the arrows of Rama. As they mingle, myriads of hues of rasa form into tunes of creation. This is the music of the flute of Krishna. The unveiling of the mystery of the unity of Rama and Krishna leads to supreme undivided knowledge. One who emanates these soul-rays of Rama-shakti and mingles them into a divine symphony of Krishna-shakti is the harbinger of transformation, Sri Ramakrishna, the Yugavatar. He is inseparable from the Supreme Divine Power - Radharani as Adyashakti.' Hearing this, the boy lost his consciousness.

I woke up in my bedroom. It was dawn. I prayed to Sree Sree Maa, Sri Ramakrishna-dev and Sri BishnupadaSiddhanta Thakur, thanking them for showering their eternal grace in my life.

[Sri Partha Pratim Chakrabarti,
*Her Blessed child***]**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(15)

It was 10pm one night. Guruma (Sri Sri Baba's wife) had provided three chapatis and pulses to Sri Sri Baba for his dinner. Sri Sri Baba started having food. Asimda, Gopal and Gour were also present there. Suddenly Sri Sri Baba threw the bowl of pulse against the wall forcibly. That caused slight damage to the wall and few grains of gram were clinging to the damaged portion of the wall.

Next day, Manick, Buta (brother of Manick) and Buta's wife came from Behala in a car. They were the ardent devotees of Sri Sri Baba. They came with the saree of Buta's wife, which seemed to be cut from the middle by scissors and few grains of pulses were sticking to it. As they showed it to Sri Sri Baba, the entire matter became clear to Asimda.

The episode last night was quite serious. The husband and wife quarreled among themselves last night and that reached a fearful extent. Buta's wife became so angry that she lost her mental balance and attempted to commit suicide by hanging, with her saree around her neck, with pious chanting of Sri Sri Baba's name. Sri Sri Baba being an antaryami i.e. the indweller of all beings, threw the bowl of pulses to bisect the saree of Butas's wife and thus she escaped death narrowly.

(16)

It was some Sunday evening and we were sitting with Sri Sri Baba. Two ladies arrived with a 10-12 year old boy from Mukherjeepara, which was located just behind the Shankarmath. They were sent to Sri Sri Baba by Sri Kalobaran Lahiri who was a childhood friend of Sri Sri Baba and also was aware of his fascinating yogic powers. The child had contracted glaucoma in one eye, which was quite advanced and declared by the doctor that the eye was going to be blind very soon and the condition of the other eye was also grave. Among the two ladies, the mother of the boy started weeping frantically in front of Sri Sri Baba. Sri Sri Baba went into a state of trance – he looked at them for some time. The next moment he was lost into deep meditation. Suddenly, Sri Sri Baba told the mother of the boy, "My mother! Isn't your house roofed with tiles and there is a gourd climber on it?" There are plenty of white flowers on the gourd plants that practically had spread on the entire roof. Squeeze a few flowers from the plant and put some juice into both of his eyes for a few days. This will cure his eyes.

After a few days, they came to Sri Sri Baba and reported that their son's eye was okay and the attending doctor too was amazed about the cure. Wehen we asked the matter to Sri Sri Baba, he said that he had cured the disease of the boy's eye as soon as heard it. As they were common people, they needed some medicine for cure of the disease and for their faith, he told them to put the gourd leaf juice into his eyes. That was basically an eyewash. (In the words of Sri Sri Baba – the juice extracted from the flowers of gourd plant was not the actual cause. Actually I had cured the boy as soon as I heard the matter from them. The juice from the flowers was an excuse.) *...to be continued*

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed

Obituary

Sree Sree Gyananandamoyee Mata has left her mortal coil on 8th February, 2015. She had a cordial relation with Sree Sree Maa. Her presence and blessings on multiple occasions at our Ashram had gratified Sree Maa's disciples. Everybody was deeply touched by her simplicity and child-like attitude. Sree Sree Maa also visited her 'Matrishakti' Ashram at Sonarpur.

Forthcoming Events

Buddha Purnima: 4th May, Monday
Spiritual Congregation: 28th June, Sunday
Guru Purnima: 31st July, Friday

Child **Dr Barun Dutta**
हिरण्यगर्भ/हिरण्यगर्भ

My Life With Anirvan
Part - XXIII

Replying to my letter of 4th October, Sri Anirvan writes,

Om *Haimavati, Shillong*
6.10.63

My dear Gautam,

Your letter of the 4th . I am glad to hear that you are heading towards light. The rains are bound to be over and we must have a sunlit path stretch before us.

Gopi will be starting by the 16th or 17th . I have asked him to come to you for the things in time. Bimal will bring the books this week and the P.M (Sri Aurobindo Path Mandir, Calcutta) people also. Yes, I wanted a flower cushion. Nothing else this time. There are only two months before I go down.

Sandhya has switched of to Kaviraji (Ayurvedic medicine) and is slightly better now. I have a very good prescription of Homeo with me, through the kindness of Mr. Aikat. When the symptoms have subsided a little more, we shall use it.

Don't worry about work. When the time comes you will be drawn into work. That is Mother's outlook. What we have to do is simply to be. Purusha Is and Prakriti Does. Even while doing, being is still the bedrock. We should never create circumstances, but meet them calmly when things come. And things are bound to come in proper time. To keep one's powder dry and wait with a full heart is all that one can hope to do. Otherwise, there is no doing but only being.

The country is going to the dogs. Let it go. The patience of the people has not yet been exhausted. But I firmly believe, there will be a silent revolution which will change everything. I feel it in the air.

Hope Bablu and Kiki are earnestly in their studies.

My love to you all...

Ever yours ... A

After Durga Puja in the end of October Sri Anirvan writes,

Om *Haimavati, Shillong*
27.10.63

My dear Gautam,

My Vijoya greetings to you, Sudha, Bablu and Kiki with much love. And to absentees also – Sharad and Jyoti.

I have given your letter to Sandhya. She will decide for herself and let you know.

I told you in my post card last week, I have received all the things, sent by you. I forgot to acknowledge the receipt of the book supplied by Bimal. Will you phone him after Puja holidays? I may not write next week.

I am glad you observed Bandhuji's birthday quietly. The Guru is nothing but configuration of the infinite. We have to remember the Infinite alone and never anything finite. We have to realize Him in Jnana and Bhakti which is comparatively easier, but nevertheless which forms the indispensable foundation of the Sadhana. The greatest difficulty is to realise Him in His Will. The Will of the Infinite finds expression in the Eternity of time. And this Eternity can be again real to us in the Absolute Moment. But in the world, in the flow of time, we cannot grasp the Eternity. So, we have only to bear the Divine Will in full faith that outwardly it will be done someday but inwardly it is done in us this very moment, which like a seed carries the huge banyan tree in it. We are little seeds, living seeds, throbbing seeds – sparks of Divinity!

About Sita's (Lizelle Reymond's name given by Anirvanji) letter. The two friends you sent were extremely nice. They did not disturb me at all. We had talks perhaps on two occasions and they have remained friends. Carlos writes to me from time to time. Only the other day, he sent me a book. So, there was nothing wrong done, I think.

My love to you all...

Ever yours ... A

P.S. Most probably, I shall be coming down to Calcutta on 9.12.63.

-Sri Gautam Dharmapal

The Philosophy of Truth

The Fundamentals of the Mind (Psychology)

Chapter 9

Bhakta: O God! You assert that Paramatma Parameshwar is all bliss and peace; but then what is the origin of our sorrow and miseries?

Mahatma: My son! This mind is the route cause of your joy and sorrow. Peace and restlessness, joy and sorrow are created by the mind and experienced by the mind itself. If mind can understand and feel its own essence, then there can be no trace of sorrow and distress. The mind of the Mahatmas and great saints is a direct testimony to this fact. The enlightened saints clearly understand the essence of their mind and experiences vividly, "I am the all pervading Paramatma, I exist eternally and everywhere as an immutable entity." The mind is ignorant of its own essence like - who am I? Where from I have originated and why? Where shall I go after leaving this body? etc. and hence it is full of doubts and imaginations. These imaginations give rise to restlessness and sorrows. The mind is full of delusion and passion. Hence you, the creation of this mind "mind world" run hither and tither in this world. Hence you cannot decide in which way to tread to reach our unvacillated destiny and get peace. Moreover, what is the route of the delusion is also unintelligible to you. A mad man cannot understand the cause of his great restlessness and distress, similarly you also do not understand that your earthly disease is the result of your own mind. If you could luckily understand that the mind is the cause of this disease, then you would have spent your life in satsang and would have tried hard to get rid of the disease by drinking the nectar of self-knowledge.

One day I was delighted to see a game. A bunch of fine threads were hanging, as fine as hairs, and two dolls were suspended from those threads. The dolls faced each other and were dancing. The speciality of the dolls was that there was apparently no connection between the threads and the doll. The two dolls were sometimes fighting with each other and sometimes dancing but they were within the limits of the threads. Because the pull of the threads were making them dance. The sight of this scene sparked off the game of the ignorant mind of the jeevas in my mind. In other words the jeevas of the world are dancing with joy and grief, smile and tears under the influence of the thread of the mind. But the jeevas, by any means, cannot transcend the thread of the mind or the limit of maya. So long the dolls are within the limit of the threads, they behave like live human. But if anybody puts the doll beyond the limit of threads, then they appear to be dead. The jeevas of the world are involved in hatred, jealousy, lust, anger etc. till you are under the influence of the thread of the mind, engrossing in the darkness of ignorance. If an enlightened saint happens to drag any of you, beyond the thread of the mind by the light of wisdom, then he too will become quiet and tranquil by the fire of dispassion. During the state of Susupti or deep sleep, you go beyond the limits of the mind and thus is in a state of perfect peace. The jeevas, who are engrossed in ignorance or maya, are unable to visualise the stillness of the atman due to the restlessness of the mind. The people of the world do not consider themselves as revolving and also looks upon the earth to be stationary, similarly the ignorant people do not understand that they are being deceived by the mind. Maya, mind or satan is the same thing and you, the ordinary people, dwell in the kingdom of the satan.

My son! You have to be practically the Lord of yourself and go beyond the threshold of the mind. Thus, get up, untie your shackles, go beyond the limits of the nature; only then can you transcend joy and sorrow, good and bad and other pair of opposites and find out your true and highest Self. *...to be continued*

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)
-Translated into English by
Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

Spiritual Advice Towards a Disciple

(14)

25th Falgun, 1342 (Bengali), Kashi-dham.

Ananta-shastrang Vahu-veditavyang, Swalpascha Kalo Vahavascha Vignah
Yat Sarabhutang Tadupasitavyang, Hamso Yatha Khiramibambu-mishram.
Puranang Bharatang Vedah Shastrani Vividhani Cha,
Putradaradi-samsare Yogabhyasasya Vignakrit.
Idang Gyanamidang Jneyang Yat Sarva-jnyatumichhasi
Vignyeyo-aksharasanmatro Jivitanchapi Chanchalam
Vihaya Sarva-shastrani Yat Satyang Tadupasyatam. *Chapter III, Uttara Gita*

Meaning: Scriptures (*shastras*) are innumerable, and equally diverse are the subjects that they deal with; life is short and laden with obstacles. Hence, the spiritual journey should be undertaken through the extraction and absorption of only the truth-lit essence of these scriptures, just as the swan (*hansa*) separates out pure milk from water-mixed milk. The *Puranas*, the *Bharata*, the *Vedas*, and various other *shastras*, wife, children and family — all act as hindrances on the path of Yoga. It is impossible to transcend beyond the scriptures through a classification of knowledge and what is worth knowing, even if one ages over a thousand years. The Universal Soul (*Paramatma*) is the indestructible ever-unwavering Existence (*Sat*), whereas life is impermanent. Therefore, renouncing your attachment towards all scriptures, endeavour to fathom within the depths of the Honest Truth (*Satya*).

Now, I will elaborate on the nature of the *Paramatma*. The manifested expression of the Universal Soul (*Paramatma*) is divine consciousness (*Chaitanya*). It is this consciousness of God's manifested Self which is perceived as the consciousness within your body as well as in the external world. *Chaitanya* is ever supreme and unblemished and is alternatively referred to as *Chit*. Hence, *Paramatma* is called *Chidrup* (the One who is manifested as *Chit*). This *Chaitanya* symbolizes the Ultimate Truth — the awareness of Absolute Existence. This Absolute Awareness is seeded within all living beings and the entire manifested world forming the very cause and source of their subsistence. He is, therefore, referred to as the *Sat* or Universal Existence. As *Chaitanya* is experienced within as Absolute Bliss, He is also characterized as Bliss (*Ananda*). Thus, the manifested expression of *Paramatma* is known as *Sachchidananda* (Existence-Consciousness-Bliss).

Absolute Self-Awareness (*Paramatma-Satta*) and *Chaitanya* is experienced by all living beings. Within the state of deep dreamless sleep (*sushupti*), the being is fully absorbed in the Universal Soul (*Brahmapolin*), and hence, although not explicitly self-conscious, one experiences the Bliss (*Ananda*) of His divine nature. The awareness of the absolute unveiled Self (*Satta*), divine Consciousness (*Chaitanya*) and holy Bliss (*Ananda*) are also reflected on a purified *satvik* mind (a mind with steadfast earnestness towards truth-lit exposition) within the profound depths of self-meditation.

However, the mechanism through which this *Satta* and *Chaitanya* of the *Paramatma* are realized by an individual is typically not the same manner in which *ananda* is experienced. The flame of a lamp has the power to burn as well as the ability to illuminate, but nobody is actually burnt through its illuminating attribute because the burning power remains embedded within the body of the flame. Similarly, all the different varieties of emotions such as happiness, sorrow, distress elation etc. that the worldly being experiences are partial expressions of *Paramatma's* Bliss; however, such experiences are never complete.

Paramatma associates with the divine primordial expressive Force (*Shakti*) and becomes the Omnipotent Almighty (*Vibhutivan*). This is the fundamental principle of His God-hood (*Ishwar-tattwa*). Due to this association with *Shakti*, *Paramatma* attains dynamism and becomes pulsating (*Chetan*) even though He is the expression of the absolute universal Consciousness (*Chaitanya-rup*). This eternal expressive Force (*Shakti*) is alternatively referred to as *Prakriti* (Nature), *Maya* etc. Although this *Shakti* is fundamentally One and same, She acts in three principal ways namely, *Satwiki-Shakti*, *Rajasiki-Shakti* and

Tamasiki-Shakti. The *Paramatma* remains the ultimate Lord and Governor of all these *Shaktis* and is therefore referred to as *Mayi* or *Mayadhish* due to this aspect.

The nature of the *Satwiki-Shakti* is exposition (*prakash-Shila*), that of the *Rajasiki-Shakti* is distraction (*vikshep-shila*) and of the *Tamasiki-Shakti* is delusion (*avaran-shila*). Through His *Satwiki-Shakti*, *Paramatma* maintains and protects the entire creation, becomes the author and preceptor of all spiritual scriptures and acts as the liberator of all beings. Hence, *Satwiki-Shakti* is considered to be His enlightening (*para*) and superior (*utkrishta*) *shakti*. *...to be continued*

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

News in Brief

3rd January: A captivating dance recital was presented by Smt. Mome Ganguly and her troupe.

13th-14th January: The 7th anniversary of the enthronement ceremony of the Guru Maharajas was conducted with full majesty. On 13th January, gifts were presented to the students of our Hotor Ashram. In the evening, an enchanting cultural session was presented by the students of Hotor Ashram after a beautiful dance performance by Smt. Shraddha Dasgupta. On 14th January, Sree Maa iniciated Smt. Basanti (Sadhvi Dheeranandamoyee) and Brahmacharini Uma (Sadhvi Prabhanandamoyee) into *sannyasa*. Puja of the Guru Maharajas was conducted in the morning by Sri Jagna Narayanda followed by yajna. In the evening, there was a cute dance performance by child artist Ashoka Bose followed by another dance program by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak. The previous issue of Hiranyagarbha was released along with the book 'Mahavatar Babaji Maharaj', in English, composed by Dr.Partha Pratim Chakrabarti. Distribution of the sacred offering (bhog) among all the devotees was also an important aspect of the ceremony in these two days. The children of 'Aikyatan', a local school, were also invited.

8th February: On this day, Sree Sree Maa along with some Ashramites visited 'Hotor Ashram'. The students, brahmacharinis and sanyasinis of the Ashram paid their heartiest homage to Sree Sree Maa. The children of the Ashram performed a beautiful cultural programme. After having prasad, they all returned back.

15th February: On the 105th birth anniversary of Sri Gobindadas Udasi Baba, Sree Sree Maa sent Bhog Prasad of Sri Sri Radhamadhav for him to 'Banga Udasi Math' at Monohar Pukur.

17th February: On the auspicious occasion of 'Shivaratri' Sree Sree Maa performed puja of Lord Shiva at night in personal solitude. Thereafter, Guru brother Sri Jagna Narayanda performed the yagna.

5th March: Prasad was offered to Sri Sri Radhamadhava in the Ashram premises and 'dol-purnima' was celebrated with a cultural programme.

13th-15th March: Sree Sree Maa visited the Ashram at Puri with some of her disciples. During her stay more than fifty destitute people were offered Prasad. Sri Jitmahanandaji, Mahanta of Divine Life Society, Puri, visited Sree Sree Maa and spent some time in spiritual discussion. On her way back, Sree Sree Maa visited 'Kheer-chora Gopinath' at Remuna.

22nd March: The fifteenth 'Adhyatmik Sabha' was organised. Our brother disciple Dr. Partha Pratim Chakrabarti (Director, IIT Kharagpur) presented the second part of the discourse on 'Upanishads'.

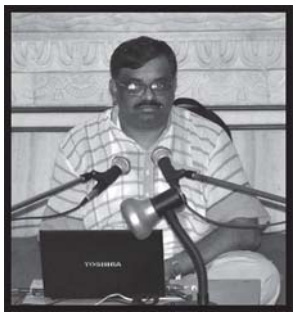

27th March: On the auspicious occasion of Asthami tithi of the Navaratri festival, puja of Mata Annapurna was held in the Annapurna temple. In the evening, a program of bhajans was organized.

28th March: A mesmerising program of bhajans was held on the holy occasion of Ram Navami.

Statement about ownership and other particulars about HIRANYAGARBHA to be published in the first issue every year after the last day of february.

1. Place of publication : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

2. Periodicity of Publication : Quarterly

3. Printer's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

4. Publisher's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

5. Editor's Name : Sri Arnab Sarkar
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.
: Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

I, Dr. Barun Dutta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledege and belief.

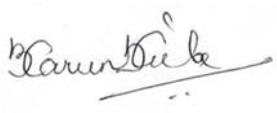

Date: 15th April, 2015 Signature of the Publisher